তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ, বর্ণালী, বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তা

বিকিরণ

বিকিরণ হলো, এক প্রকার শক্তি স্থানান্তর বা নির্গমন প্রক্রিয়া যা তরঙ্গ বা কণা আকারে শূন্য স্থান বা অন্য কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে।

বিকিরণের প্রকৃতি

বিচ্ছুরিত কণার শক্তির উপর নির্ভর করে বিকিরণের প্রকৃতি দুই ধরণের। যথা—

1. আয়োনাজিং বিকিরণ
2. নন–আয়োনাজিং বিকিরণ

আয়োনাজিং বিকিরণ

পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে পরমাণু ও অনুকে আয়নিত করার মত পর্যাপ্ত শক্তি (প্রায় 10 eV) বিশিষ্ট বিকিরণকে আয়োনাইজিং বিকিরণ বলে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ যা α, β, বা γ রশ্মির সাথে সাথে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রন বা পজিট্রন এবং ফোটন নির্গত করে তা আয়নাজিং বিকিরনের একটি সাধারণ উৎস। অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে এক্স-রে, পজিট্রন, নিউট্রন, মেসন যা মহাজাগতিক রশ্মি (কসমিক রে) এবং পৃথিবীর বায়ু মন্ডলের আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন যে আহিত কণাসমূহ প্রবেশ করে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic ray) বলা হয়।

নন–আয়োনাজিং বিকিরণ

যেসব বিকিরণ পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙ্গে পরমাণ ও আয়নিত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি রাখে না, তাদেরকে নন-আয়োনাইজিং বিকিরণ বলে।

বিকিরণের প্রকারভেদ

- তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ বা তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ, যেমন তাপ, রেডিও তরঙ্গ, দৃশ্যমান আলো, এক্স-রে, এবং গামা বিকিরণ (γ)।
- পারমাণবিক বিকিরণ, যেমন আলফা বিকিরণ (α), বিটা, বিকিরণ (β) এবং নিউট্রন বিকিরণ (কণার নন-জিরো বিশ্রাম শক্তি)।
- শাব্দ বিকিরণ, যেমন আল্ট্রাসাউন্ড, শব্দ, এবং সিসমিক তরঙ্গ (একটি বাহ্যিক ট্রান্সমিশন মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল)।
- মহাকর্ষীয় বিকিরণ, যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বা স্থান-কাল বক্রতা রূপ নেয়।

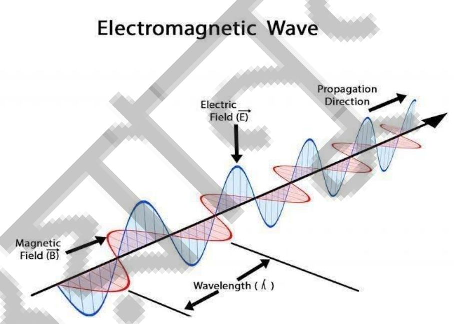
তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ

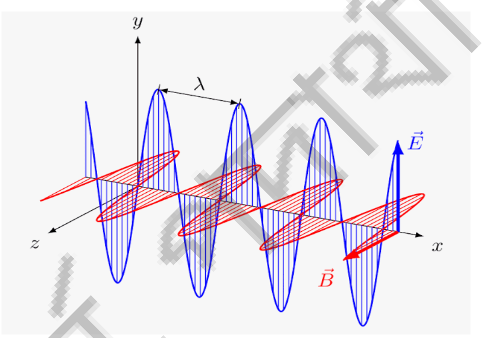
যে তরঙ্গের তড়িৎ ও চৌম্বক উপাংশ থাকে তাকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বলে। অর্থাৎ কোনো স্থানে পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকলে সেটি যে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে তাকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বলে। পদার্থবিদ্যায়, তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ দ্বারা তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গকে বোঝায়।

তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ (Electromagnetic radiation) হলো- এক প্রকার তরঙ্গধর্মী শক্তি। সংক্ষেপে একে বলা হয় E-M radiation বা EMR। মূলত যখন কোনো তড়িৎ আধান স্পন্দিত হলে বা ত্বরণগতি লাভ করলে, ওই আধান থেকে একটি তড়িৎশক্তি যুক্ত এবং চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তা বাইরে দিকে ধাবিত হয়। এই তরঙ্গকে বলা হয় তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ।

সময়ের পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্রের এবং চৌম্বকক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল দেখান যে এরুপ তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র স্থান দিয়ে সঞ্চালিত হয় এবং এর বেগ আলোর বেগের সমান। এ ধরনের তরঙ্গই তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ। এ তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো জড় মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গকে স্বচালিত অনুপ্রস্থ তরঙ্গরূপে কল্পনা করা হয়, যার পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থানকারী একটি তড়িৎ ও একটি চৌম্বকীয় অংশ আছে।

কোনো আধান যুক্ত কণা স্থির থাকলে তার চারপাশে একটি তড়িৎ ক্ষেত্রের (E) সৃষ্টি হয়। আবার, কোনো আধান যুক্ত কণা যদি সমবেগে ভ্রমণ করতে থাকে তাহলে সেই কণার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র (B) তৈরি হয়। তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সমন্বয়ে তৈরী হয় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গে তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের স্পন্দন পরস্পরের সাথে লম্ব ও এরা উভয়ই তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সাথে লম্ব।





ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের দুটি উপাংশ তথা তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তার যথাক্রমে E_0 এবং B_0 হলে,

$$\frac{E_0}{B_0} = c$$

এখানে C হচ্ছে আলোর দ্রুতি। ম্যাক্সওয়েল গাণিতিকভাবে আরও প্রমাণ করেন যে, শূন্যস্থানে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বেগ V হলে,

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

এখানে, μ_0 = শূন্যস্থানে চৌম্বক প্রবেশ্যতা (permeability) = 1.26×10^{-6} Hm^{-1}
এবং ε_0 = শূন্যস্থানের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা (permitivity) = 8.85×10^{-12} Fm^{-1}

উপরোক্ত সমীকরণে এই মানগুলো বসিয়ে দেখা যায়— শূন্যস্থানে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বেগ, শূন্যস্থানের আলোর বেগ C এর সমান হয়। অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে ম্যাক্সওয়েল সিদ্ধান্ত নেন, আলো একপ্রকার তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ। শুধু দৃশ্যমান আলোই নয়, বেতার তরঙ্গ, মাইক্রো তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি সকল বর্ণালীই হলো তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।

তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের কম্পনের ফলে সঞ্চালিত শক্তিকে তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ বা তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বলে। আমরা জানি যে, পরিবর্তনশীল চৌম্বক ফ্লাক্স তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন করে এবং পরিবর্তনশীল তড়িৎ ফ্লাক্স চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কোনো অঞ্চলে যদি তাড়িৎ বা চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটে তাহলে সে অঞ্চলের বাইরে পারিপার্শ্বিক স্থানে আলোর দ্রুতিতে তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র সঞ্চালিত হবে। এ রকম চলমান তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে বলা হয় তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ বা তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ। সুতরাং তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হলো স্থান দিয়ে আলোর দ্রুতিতে গতিশীল তড়িৎ ও চৌম্বক আলোড়ন। ১৮৮৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেনরিখ হার্টজ সর্বপ্রথম তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ পরীক্ষামূলক ভাবে উৎপাদন করেন এবং সনাক্ত করার ব্যবস্থা করেন। তার পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বক সংক্রান্ত সমীকরণগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের উৎস

আমরা জানি যে, স্থির তড়িৎ আধানের চারদিকে তড়িৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। আবার সুস্থিত তড়িৎ প্রবাহ চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। কিন্তু ত্বরিত (ত্বরণপ্রাপ্ত) আধান সৃষ্টি করে সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র, যা স্থানের উপর নির্ভরশীল। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত। এই চৌম্বকক্ষেত্র আবার নির্বর করে সময় ও স্থানের উপর। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের উৎস হলো ত্বরিত তথা ত্বরণপ্রাপ্ত (Accelerated) তড়িৎ আধান। স্পন্দনশীল তড়িৎ আধান থেকে সৃষ্টি হয় তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের।

কোনো বিন্দুতে স্পন্দনশীল তড়িৎ আধান ঐ বিন্দুতে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করে, যা সাইনসদৃশ ভাবে নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে পরিবর্তিত হয়। এবং এই ফ্রিকুয়েন্সি বা স্পন্দন হার বা কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট্যপূর্ণ তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর সৃষ্টি করে।

তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের ধর্ম

যদিও বিভিন্ন তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ বা বর্ণালীর উৎস বিভিন্ন এবং এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু কিছু কিছু ধর্ম বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে মিল আছে। যথা—

- তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো জড় মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
- তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ ভ্যাকুয়াম বা মুক্তস্থান বা শূন্যস্থানে আলোর দ্রুতি নিয়ে সঞ্চালিত হয়।
- ত্বরিত (ত্বরণপ্রাপ্ত) তড়িৎ আধান দ্বারা তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।
- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের সময় এদের দীপন তীব্রতা বিপরীত বর্গীয় নিয়ম মেনে চলে। অর্থাৎ দুরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে এদের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। দীপন তীব্রতা I এবং উৎস থেকে দুরত্ব r হলে,

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

- তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ এক ধরণের অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গ। স্পন্দনশীল তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা গতিশীল তরঙ্গ প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়।
- তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র তরঙ্গ সঞ্চালনের অভিমুখের সাথে সমকোণে স্পন্দনশীল হয় এবং এরা পরস্পরের সাথে সমকোণে থাকে।
- এই বিকিরণের সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য $C = f\lambda$ সমীকরণ প্রযোজ্য। যেখানে C, f ও λ (ল্যাম্ডা) যথাক্রমে আলোর দ্রুতি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ফ্রিকুয়েন্সি (কম্পাঙ্ক)।
- যথোপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের সবধরনের বিকিরণের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন ও ব্যতিচার ইত্যাদি ঘটে।
- এদের তল পোলারায়ন ঘটে। এই ধর্ম থেকে এদের অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বা দীঘল তরঙ্গ থেকে পৃথক করা যায়।
- এই তরঙ্গের তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তারের অনুপাত অর্থাৎ $E/B = C$ হয়।
- এই তরঙ্গের শক্তি তড়িৎ ও চৌম্বক ভেক্টরের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয়।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাংক (ফ্রিকুয়েন্সি) অনুসারে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের পৃথক ক্রম বিশিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপ বা দলের ক্রমবন্টনকে বলা হয় তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালী। অর্থাৎ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক সমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, এদেরকে তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী বলে।

সমস্ত ধরনের জ্ঞাত তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের কম্পাঙ্ক এবং তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (বা সংশ্লিষ্ট ফোটনের) সমষ্টিকে এক কথায় তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বলা হয়।

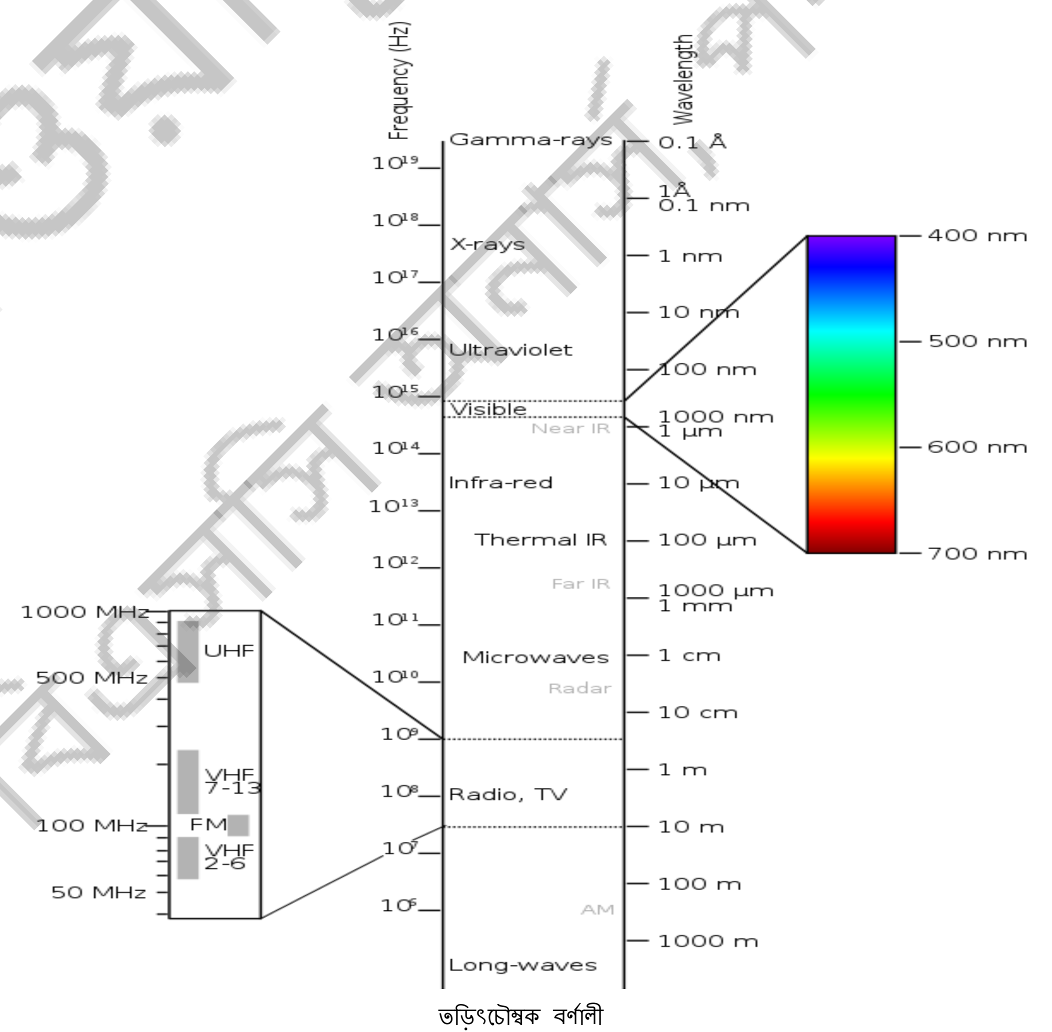
অর্থাৎ তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ রেঞ্জকে তাড়িৎচৌম্বক বর্ণালী বলা হয়।

কিন্তু কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী ভিন্ন অর্থ বহন করে। আসলে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী হল ঐ বস্তু থেকে নির্গত বা বস্তু কর্তৃক বিশোষিত তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ।

কোনো পদার্থ থেকে তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের ফলে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। উৎসের শক্তির উপর নির্ভর করে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তির অবিচ্ছিন্ন কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুচ্ছ তৈরী হয়। এই সমগ্র তরঙ্গগুচ্ছকে এককথায় বলা হয় তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী। সবচেয়ে কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গ হল বেতার তরঙ্গ, অন্যদিকে গামা তরঙ্গ হল সবচেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গ। বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক হাজার কিলোমিটার থেকে পরমাণুর আকারের মতো ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের হতে পারে। দৃশ্যমান আলো বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার। সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য মহাজাগতিক আকারের সমতুল, আবার সবচেয়ে ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল প্ল্যাংকের দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি।

এই বর্ণালী বা স্পেকট্রামের ক্ষুদ্র অংশ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, যা আলো নামে পরিচিত। সম্পূর্ণ স্পেকট্রামকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতোগুলো ছোট ছোট রেঞ্জে বিভক্ত করে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যথা- বেতার তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, আলোক রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স-রে ও গামা রশ্মি।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনেক পদার্থবিদ মনে করতেন তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ নিরবচ্ছিন্ন এবং অসীম।



তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী

পদার্থের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য বর্ণালীবীক্ষণে প্রায় সব ধরনের তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী আবিষ্কারের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোক অংশ (আলো) সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল। প্রাচীন গ্রীকরা জানত আলো সরলরেখায় গমন করে, এছাড়াও তারা আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরন সহ বেশ কিছু ধর্ম পর্যবেক্ষণ করেছিল। আলো সম্পর্কে অনুসন্ধান চলতে থাকে এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আলোর তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা এই জাতীয় পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব তৈরী হয়।

দৃশ্যমান আলো বর্ণালী বাদ দিলে তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী প্রথম আবিষ্কার করেন উইলিয়াম হার্শেল। তিনি ১৮০০ সালে অবলোহিত বিকিরণ (ইনফ্রারেড) আবিষ্কার করেন। প্রিজম দ্বারা বিচ্ছুরিত আলোক বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণের তাপমাত্রা তিনি থার্মোমিটার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সেই সময় তিনি লক্ষ করেন, বর্ণালীতে তাপমাত্রা সর্বাধিক হয় দৃশ্যমান লাল বর্ণ অতিক্রম করে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণ হল 'ক্যালোরিফিক রশ্মি' বা 'তাপ উৎপাদনকারী তরঙ্গ' - যা আলোর ন্যায় একপ্রকার তরঙ্গ, কিন্তু দেখা যায় না।

পরের বছর ইয়োহান রিটার বর্ণালীর অপর প্রান্তে কাজ করার সময় লক্ষ করেন অদৃশ্য আলোক বর্ণালী, যা কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে সাহায্য করে। তিনি ঐ তরঙ্গের নাম দেন 'কেমিক্যাল রশ্মি' বা 'রাসায়নিক তরঙ্গ'। এই তরঙ্গের ধর্ম বেগুনি বর্ণের দৃশ্যমান আলোর মতো হলেও বর্ণালীতে তার অবস্থান বেগুনি বর্ণের অনেক পরে। পরে এই তরঙ্গের নাম দেওয়া হয় 'অতিবেগুনী রশ্মি' তথা UV (আল্ট্রাভায়োলেট) রশ্মি।

১৮৪৫ সালে মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের সঙ্গে তড়িৎচৌম্বকত্বের সম্পর্ক আছে। চৌম্বকক্ষেত্রের উপস্থিতিতে আলোর মেরুকরন (পোলারাইজেশন) তলের আবর্তন ঘটে।

এরপর ১৮৬০ এর দশকে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তড়িৎচৌম্বকক্ষেত্রের জন্য চারটি আংশিক অবকল সমীকরণ (ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহ) তৈরী করেন। এর মধ্যে দুটি সমীকরণ নির্দেশ করে তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তরঙ্গের সম্ভাব্য আচরণ কেমন হবে।

তত্ত্বমূলকভাবে ম্যাক্সওয়েল তরঙ্গের গতিবেগ নির্ণয় করেন এবং দেখেন যে, তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের (ঐ সময় তা নির্ভুল ভাবে জানা ছিল) সমান। তরঙ্গ এবং আলোর গতিবেগের চমকপ্রদভাবে মিলে যাওয়ায় ম্যাক্সওয়েল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলো একপ্রকার তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহ নির্দেশ করে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক অসীম হতে পারে এবং তারা প্রত্যেকেই আলোর গতিবেগে গমন করে। এটিই সর্বপ্রথম সমগ্র তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়। ম্যাক্সওয়েল অবলোহিত বিকিরণের মতো কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গ সহ সমগ্র তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর উৎপত্তি তত্ত্বগত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। এক নির্দিষ্ট প্রকার তড়িৎ বর্তনীর মধ্যে দোদুল্যমান (oscillating) তড়িতাধান তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি প্রমাণ করার এবং ঐরূপ কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গ শনাক্ত করার চেষ্টা করেন পদার্থবিজ্ঞানী হেনরিখ হার্টজ। তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি এবং শনাক্তকরণে সক্ষম একটি যন্ত্র তৈরী করেন। ঐ তরঙ্গ আজ বেতার তরঙ্গ নামে পরিচিত। হেনরিখ হার্টজ বেতার তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্ক পরিমাপ করেন এবং দেখেন এই তরঙ্গও আলোর গতিবেগে গমন করে। এছাড়াও তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, আলোর মতো এই নতুন বিকিরণও বিভিন্ন অন্তরক তল (Dielectric Medium) দ্বারা প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়। তিনি গাছের রজন নির্মিত লেন্স (lens) দ্বারা এই তরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হন। পরে গবেষণা করে তিনি মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টি করেন ও তার বিভিন্ন ধর্ম পর্যবেক্ষণ করেন। এই নতুন ধরনের তরঙ্গ বিভিন্ন প্রযুক্তি তথা, বেতার, ওয়্যারলেস টেলীগ্রাফ ইত্যাদি আবিস্কারের পথ উন্মোচিত করে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিলহেল্ম কনরাড রন্টজেন উচ্চবিভব প্রভেদের মধ্যে একটি ফাঁকা নল (vaccum tube) নিয়ে গবেষণা করাকালীন এক নতুন ধরনের তরঙ্গ লক্ষ করেন। তিনি এই বিকিরণের নাম দেন রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে)। তিনি দেখেন এই তরঙ্গ মানব শরীরের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কিন্তূ অধিক ঘনত্ব যুক্ত অংশ যেমন - শরীরের হাড় দ্বারা প্রতিফলিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই তরঙ্গের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর শেষ অংশ পূরণ হয় গামা- রশ্মি আবিষ্কারের মাধ্যমে। ১৯০০ সালে পল ভিলার্ড তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করার সময় নতুন এক ধরনের বিকিরণ লক্ষ করেন। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন এই বিকিরণ আলফা, বিটা কণা সদৃশ অন্য কোনো কণা সমন্বিত বিকিরণ, কিন্তু তার ভেদন ক্ষমতা আলফা বা বিটা কণা অপেক্ষা অনেক বেশি।

পরে ১৯১০ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরি ব্র্যাগ প্রমাণ করেন গামা-রশ্মি প্রকৃতপক্ষে তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ, কোনো কণা সমন্বিত বিকিরণ নয়।

১৯১৪ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৯০৩ সালে উপলব্ধি করেছিলেন এই রশ্মি মূলগতভাবে আলফা বা বিটা থেকে পৃথক, তখন তিনি এই রশ্মির নামকরণ করেন গামা-রশ্মি) এবং এডওয়ার্ড আন্দ্রে গামা- রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করে দেখেন তার ধর্ম এক্স-রশ্মির মতোই, কিন্তু রঞ্জন রশ্মি অপেক্ষা তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম ও কম্পাঙ্ক বেশি।

কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং পার্টিকেল ফিজিক্স

পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থ এবং শক্তির সবচেয়ে মৌলিক স্তরের অধ্যয়ন করা হয়, সেটি হচ্ছে কোয়ান্টাম ফিজিক্স। পদার্থের এই বিশেষায়িত শাখার কেন্দ্রীয় তত্বটি হল, শক্তি 'কোয়ান্টা' নামক এক ধরনের অবিভাজ্য প্যাকেটের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য মাইক্রোস্কোপিক বিষয়াদির (অণু,পরমাণু, ইলেক্ট্রন ইত্যাদি) মতো কোয়ান্টা একইভাবে আচরণ করে না। কোয়ান্টাম ফিজিক্স অনুযায়ী- কণা (particles) তরঙ্গের (wave) মতো আচরণ করে আবার তরঙ্গ, কণার মতো আচরণ করে। পদার্থবিজ্ঞানের এ বিশেষায়িত শাখায় কোয়ান্টাম তত্বানুসারে, পারমাণবিক এবং অতিপারমাণবিক (subatomic) পর্যায়ে পদার্থ কণা'র (particles) আচরণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

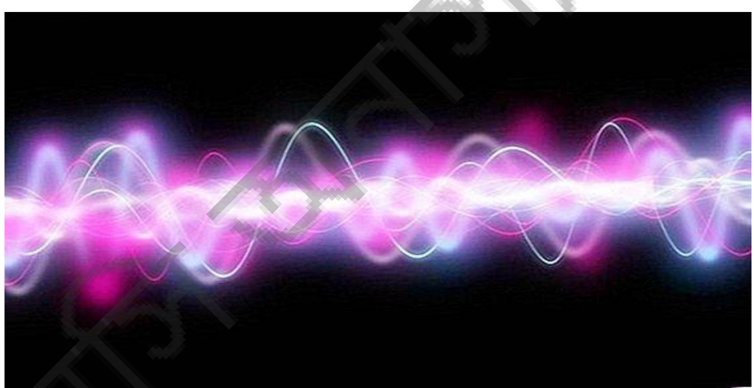
পারমাণবিক এবং অতিপারমাণবিক পর্যায়ে পদার্থ বা কণার বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ ব্যাখ্যা করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর মূলভিত্তি। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের পাশাপাশি কোয়ান্টাম কেমেস্ট্রি, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, কোয়ান্টাম টেকনোলজি এবং কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সাইন্সের মূলভিত্তি হিসেবেও কাজ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

কণা পদার্থবিজ্ঞান বা Particle Physics হলো আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি প্রধান শাখা যার কাজ হল পদার্থ এবং বিকিরণের মৌলিক উপাদান এবং তাদের মাধ্যে মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করা। এই শাখার আর এক নাম হল উচ্চ-শক্তি পদার্থবিজ্ঞান (High Energy Physics)। এই নামকরণের প্রধান কারণ হল এই যে, অধিকাংশ মৌলিক কণাই সাধারণ অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না কিন্তু অতিশক্তি সম্পন্ন কণা সংঘাতে এই সকল কণার সৃষ্টি এবং পর্যবেক্ষণ সম্ভব। কণা শব্দটি সাধারণভাবে নানারকম অতিক্ষুদ্র বস্তুসমূহ (যেমন প্রোটন কণা, গ্যাসের কণা, এমনকি ধূলিকণা) বুঝাতে ব্যবহৃত হলেও কণা পদার্থবিজ্ঞান সাধারণভাবে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা সমূহ এবং তাদের আন্তঃক্রিয়া ব্যাখা করতে প্রয়োজনীয় মৌলিক ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে।

কোয়ান্টা

পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স', যেখানে আলো বা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কণাধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়। প্লাঙ্কের তত্ব অনুসারে - আলোকশক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে, যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গুচ্ছ বা প্যাকেজ আকারে বের হয় তার প্রতিটি প্যাকেজকে একেকটি কোয়ান্টা বলে।

ফোটন



ফোটন হচ্ছে আলো অর্থাৎ তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা বিকিরণের কণা বা একক। এটি একপ্রকার মৌলকণা। অর্থাৎ পদার্থের ক্ষুদ্র অংশকে যেমন পরমানু বলে, তেমনি বিকিরণের ক্ষুদ্র অংশ ফোটন নামে পরিচিত। ফোটন ভরহীন, ফলে এরা সর্বদা শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগের সমান বেগে ধাবিত হয়। ফোটন একপ্রকার বোসন কণা।

ফোটনের কিছু ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য

- ফোটন আলোর বেগে প্রবাহিত হয়।
- ফোটনের স্থিতি ভর শূন্য।
- প্রতি ফোটনের নির্দিষ্ট শক্তি এবং নির্দিষ্ট রৈখিক ভরবেগ আছে।
- ফোটন তড়িৎ নিরপেক্ষ। এর কোন চার্জ নেই।
- ফোটনের কণা এবং তরঙ্গ দ্বৈত রুপ আছে।

তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের শক্তি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাংক

তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গকে সাধারণত নিম্নোক্ত তিনটি ভৌত রাশির যে কোনোটির দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে—

1. কম্পাঙ্ক— তথা ফোটনের কম্পাঙ্ক। একে সাধারণত f বা ν (নিউ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
2. তরঙ্গদৈর্ঘ্য— তথা তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য। একে সাধারণত λ (ল্যাম্ডা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
3. তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা আলোক কণার (ফোটন) শক্তি। একে সাধারণত E দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কোনো তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা বিকিরণের শক্তি, (E) তার কম্পাঙ্ক, (f) এর সমানুপাতিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য, λ এর ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা বিকিরণের কম্পাঙ্ক যত বেশি হবে তার শক্তি তত বেশি হয়। অনুরূপভাবে, তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি হবে, এর শক্তি তত কম হবে।

নিচে রাশিগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের তিনটি সমীকরণ দেয়া হলো—

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad ; \quad f = \frac{E}{h} \quad ; \quad E = \frac{hc}{\lambda}$$

যেখানে, C = আলোর বেগ, শূন্যস্থানে এর মান 3×10^{8} ms^{-1}
প্লাংকের ধ্রুবক, h = 6.6260755×10^{-34} J s

ফোটনের ভর না থাকলেও ভরবেগ আছে

ভরবেগের জন্য ভর থাকাটা বাধ্যতামূলক নয়, শক্তি থাকলেই যথেষ্ট।

চিরায়ত বলবিদ্যা বা নিউটনীয় বলবিদ্যায় Momentum বোঝাতে 'ভরবেগ' শব্দটির ব্যবহার করা হয়। কারণ সেখানে Momentum, $p=mv$

কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যা বা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এই সমীকরণ প্রযোজ্য নয়। এজন্য আমাদেরকে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ এর পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহার করতে হবে, যেটা হচ্ছে—

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$$

যেখানে m_0 দ্বারা বস্তুর নিশ্চল ভরকে (যেটাকে আমরা সবাই 'ভর' বলে থাকি) বোঝানো হয়েছে।

এবার ফোটনের ক্ষেত্রে এই সমীকরণ প্রয়োগ করতে হলে m_0 এর মান শূন্য বসিয়ে দিতে হবে, তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়—

$$E^2 = (pc)^2$$
$$\text{বা } p^2 = (E/c)^2$$

দেখাই যাচ্ছে যে ফোটনের ক্ষেত্রে নিশ্চল ভর শূন্য হলেও তাঁর ভরবেগ শূন্য হওয়ার কোনো কারণ নেই কেননা ফোটনের শক্তি E এর মান শূন্য নয়।

আবার প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম সমীকরণ $E = h\nu$ প্রয়োগে পাওয়া যাচ্ছে, $p = h/\lambda$ বা $\lambda = h/p$, যেখানে λ হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য। আবার, আলোর ক্ষেত্রে $\lambda = c/\nu$, যেখানে ν (নিউ) হলো কম্পাঙ্ক।

লুই দ্য ব্রগলি পরবর্তীতে দেখিয়েছিলেন যে $\lambda = h/p$ সমীকরণটি শুধু ফোটন নয়, সব কোয়ান্টাম কণার জন্যই প্রযোজ্য। এই সমীকরণটিকে সার্বজনীন ধরে নিলে আমরা দেখতে পাই, ফোটনের জন্য নিউটনীয় ভরবেগের ধারণা এক অসঙ্গতির জন্ম দেয়।

সুতরাং বলা যায় চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ধারণায় ফোটনের ভরবেগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ফোটনের ভরবেগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক পদার্থবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। যেখানে ফোটনের ভর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে, এখন নিশ্চতভাবেই বলা যায়, ফোটনের ভর না থাকলেও ভরবেগ বিদ্যমান।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিস্তার

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, কম্পাঙ্কের বিস্তার জ্যোতির্বিদ্যা পরিসর যথা— 2.4×10^{23} Hz (এক গিগাইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন গামারশ্মি) থেকে মহাকাশ জগতের আয়নিত মাধ্যমে প্লাজমা কম্পাঙ্ক 1 kHz পর্যন্ত হতে পারে।

তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক।

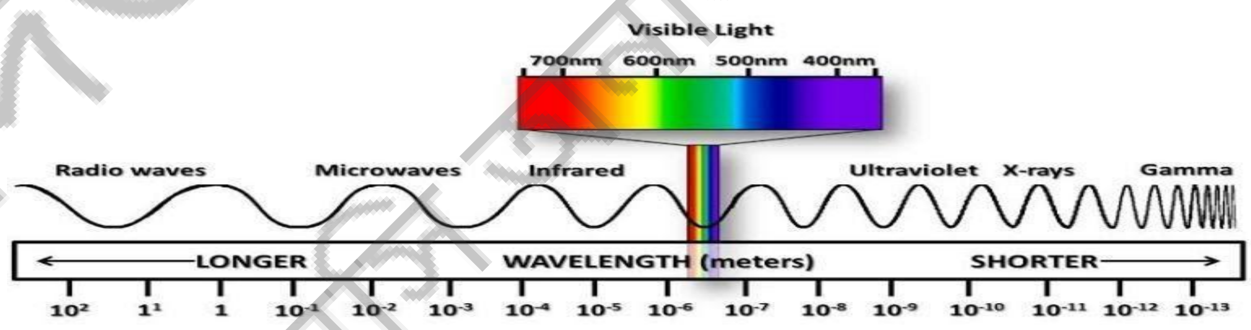
গামারশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই কম, যা একটি পরমাণুর আকারের কিছু ভগ্নাংশের সঙ্গে তুলনীয়। অন্যদিকে বর্ণালীর অপর প্রান্তের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই মহাবিশ্বের আয়তনের মতোই বড়।

ফোটনের শক্তি তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক।

সুতরাং গামারশ্মির ফোটনের শক্তি সবচেয়ে বেশি (কয়েক লক্ষ কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট)।

অন্যদিকে বেতার তরঙ্গের ফোটনের শক্তি খুবই কম।

যখন তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ জড় মাধ্যমে প্রবেশ করে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। মাধ্যম যাই হোক না কেন, তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলতে শূন্যমাধ্যমে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বোঝানো হয়; যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা আলাদা করে উল্লেখ করা হয় না।



সাধারণত তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের ধর্ম তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। যখন তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ একটি অণু বা পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তখন তার ধর্ম নির্ভর করে তরঙ্গে উপস্থিত ফোটনের শক্তির উপর।

বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০ ন্যানোমিটার থেকর ৭০০ ন্যানোমিটার) ছাড়াও আরো বিস্তীর্ণ অংশের তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী শনাক্ত করা সম্ভব। একটি সাধারণ গবেষণাগারের বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র ২ ন্যানোমিটার থেকে ২৫০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে সক্ষম। এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থ, গ্যাস এমন কি বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের ভৌত ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। অনেক হাইড্রোজেন পরমাণু ২১.১২ সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর বেতার তরঙ্গ বিকীর্ণ করে। আবার অনেক নাক্ষত্রিক নীহারিকা ৩০ হার্টজ ও তার কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গ সৃষ্টি করে, যা তাদের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও অনেক মহাজাগতিক বস্তু থেকে ২.৯×১০^{২৭} হার্টজ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের ভিন্ন নামকরণের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা

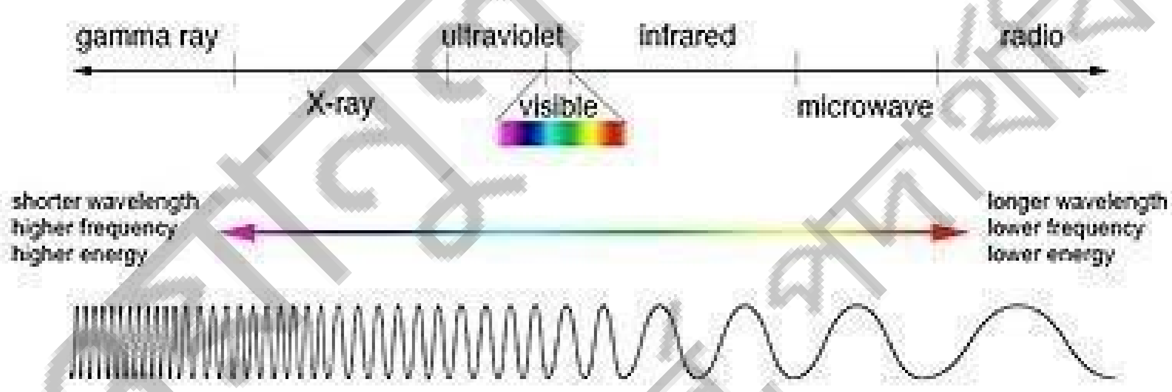
তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ সমগ্র বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে পদার্থের সঙ্গে ভিন্নভাবে বিক্রিয়া করে থাকে। এই বিক্রিয়াগুলির ধরন এতটাই আলাদা যে, প্রথমে বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছিল, যেন তারা বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ। তাই, যদিও এই বিভিন্ন ধরণের তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ অবিচ্ছিন্ন কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বর্ণালী তৈরী করে, তা সত্বেও ব্যবহারিক কারণে বিক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে সমগ্র বর্ণালীকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের প্রকারভেদ

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন ব্যান্ডের সীমানা বক্ষ্যমান আলোচনায় বিস্তারিত আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন ব্যান্ডের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমানা নেই, বরং রংধনুর (এটি দৃশ্যমান বর্ণালীর উপবর্ণালী) রঙের মতো একটি ব্যান্ড পরের ব্যান্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে থাকে। প্রতিটি ব্যান্ডের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ধর্মের মধ্যে তাকে পরিবেষ্টন করে রাখা অপর দুই ব্যান্ডের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ধর্মের মিশ্রণ ঘটে। উদাহরণ স্বরুপ, লাল বর্ণের আলো অবলোহিত বিকিরণের সদৃশ, যা কিছু রাসায়নিক বন্ধনে শক্তি প্রদান করে তাকে উত্তেজিত করে যেটি সালোকসংশ্লেষের সময় রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটার জন্য এবং আমাদের দৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন অংশ

তড়িৎচৌম্বক বিকিরণকে মোটামুটি নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।



1. বেতার তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ)
2. অণুতরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ)
3. টেরাহার্জ বিকিরণ
4. ইনফ্রারেড বা অবলোহিত বিকিরণ
5. দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ
6. অতিবেগুনী রশ্মি (আল্ট্রাভায়োলেট)
7. রঞ্জন রশ্মি (X-ray)
8. গামা রশ্মি

তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া

বর্ণালীর বিভিন্ন অংশ	পদার্থের সঙ্গে প্রধান প্রধান বিক্রিয়া
বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভ	বিশাল আয়তনের বস্তুর ক্ষেত্রে আধান বাহকদের একত্রিত কম্পন (প্লাজমা কম্পন)। এর একটি উদাহরণ হতে পারে অ্যান্টেনার মধ্যে দোদুল্যমান ইলেক্ট্রনের গতি।
মাইক্রোওয়েভ বা অণুতরঙ্গ থেকে দূরবর্তী অবলোহিত বিকিরণ	প্লাজমা কম্পন (Plasma oscillation), অণুর ঘূর্ণন।
সন্নিকট অবলোহিত বিকিরণ	অণুর স্পন্দন, প্লাজমা কম্পন (মূলত ধাতুর ক্ষেত্রে)
দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ	অণুর ইলেক্ট্রনের উত্তেজিতকরণ (উল্লেখ্যঃ মানব চক্ষুর অক্ষিপটের রঞ্জক পদার্থের অণু), প্লাজমা কম্পন (মূলত ধাতুর ক্ষেত্রে)
অতিবেগুনী রশ্মি (UV)	অণু এবং পরমাণুর যোজ্যতা ইলেক্ট্রনের উত্তেজিতকরণ, আলোক তড়িৎ ক্রিয়ায় ইলেক্ট্রনের নিঃসরণ
রঞ্জন রশ্মি (X-ray)	পরমাণুর কেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনের উত্তেজিতকরণ এবং নিঃসরণ, কম্পটন বিক্ষেপন (Compton scattering) (কম পরমাণুক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট পরমাণুর ক্ষেত্রে)
গামা রশ্মি	ভারী উপাদানের উচ্চশক্তি সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনের নিঃসরণ, কম্পটন বিক্ষেপন (সব পরমাণুক্রমাঙ্ক পরমাণুর ক্ষেত্রে), পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উত্তেজিতকরণ, নিউক্লিয়াসের পৃথকীকরণ।
উচ্চশক্তি সম্পন্ন গামা রশ্মি	কণা ও তার প্রতিকণার সৃষ্টি, উচ্চশক্তি সম্পন্ন একটি ফোটন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে উচ্চশক্তি সম্পন্ন কণা ও তার প্রতিকণার স্রোত সৃষ্টি করে।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন রেঞ্জের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের গড় বিস্তার

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী	তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গড় বিস্তার	কম্পাঙ্কের গড় বিস্তার
দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ)	> ১০ মিটার	< ৩ x $১০^{৭}$ হার্টজ
ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ)	১০ সেন্টিমিটার - ১০ মিটার	৩ x $১০^{৭}$ - ৩ x $১০^{৯}$ হার্টজ
অণুতরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ)	১ মিলিমিটার - ১০ সেন্টিমিটার	৩ x $১০^{৯}$ - ৩ x $১০^{১১}$ হার্টজ
দূরবর্তী অবলোহিত	১০ মাইক্রোমিটার - ১ মিলিমিটার	৩ x $১০^{১১}$ - $১০^{১৩}$ হার্টজ
মধ্য অবলোহিত	২.৫ মাইক্রোমিটার - ১০ মাইক্রোমিটার	$১০^{১৩}$ - $১০^{১৪}$ হার্টজ
সন্নিকট অবলোহিত	৭০০ ন্যানোমিটার - ২.৫ মাইক্রোমিটার	$১০^{১৪}$ - ৪ x $১০^{১৪}$ হার্টজ
দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ	৪০০ - ৭০০ ন্যানোমিটার	৪ x $১০^{১৪}$ - ৭ x $১০^{১৪}$ হার্টজ
অতিবেগুনী রশ্মি	১০ - ৪০০ ন্যানোমিটার	৭ x $১০^{১৪}$ - ৩ x $১০^{১৬}$ হার্টজ
রঞ্জন রশ্মি (X-ray)	১ - ১০ ন্যানোমিটার	৩ x $১০^{১৬}$ - ৩ x $১০^{১৯}$ হার্টজ
গামা রশ্মি	< ১ ন্যানোমিটার	> ৩ x $১০^{১৯}$ হার্টজ

এই শ্রেণীবিভাগ ক্রমবর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য (যা তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের বৈশিষ্ট্য) অনুসারে করা হয়েছে। সাধারণভাবে এই শ্রেণীবিভাগ সঠিক হলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রায়ই নিকটবর্তী দুই তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর ব্যান্ডের মধ্যে কিছুটা সমপাতন লক্ষ্য করা যায়।

গামা রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কিছুটা উৎসের উপর নির্ভরশীল। তেজস্ক্রিয়তার ফলে যে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটনের স্রোত সৃষ্টি হয়, তা হল গামা রশ্মি। অন্যদিকে ইলেক্ট্রনের এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে পরিবৃত্তির সময় রঞ্জন রশ্মি সৃষ্টি হয়, এই প্রক্রিয়া পরমাণুর কেন্দ্রকের উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।
সাধারণভাবে নিউক্লিয়াসের পরিবৃত্তি ইলেক্ট্রনের পরিবৃত্তি অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই গামা রশ্মি রঞ্জন রশ্মি অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন। কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রমও থাকে। ইলেক্ট্রনের পরিবৃত্তির প্রসঙ্গে বলা যায়, মিওন পরমাণুর (Muon) পরিবৃত্তির ফলে রঞ্জন রশ্মি সৃষ্টি, যদিও তার শক্তি ৬ মেগা ইলেক্ট্রন-ভোল্টের (০.৯৬ পিকো-জুল) থেকেও বেশি হয়। যেখানে অনেক নিউক্লিয়াসের পরিবৃত্তির শক্তি তার চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ কম (যথা: থোরিয়াম - ২২৯ এর নিউক্লিয়াসের পরিবৃত্তির শক্তি ৭.৬ ইলেক্ট্রন-ভোল্ট) হলেও, নিউক্লিয়াস থেকে উৎপত্তির জন্য নিঃসৃত ফোটনের স্রোতকে গামা রশ্মি বলা হয়ে থাকে।

প্রচলিত ধারণা হল - নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হওয়া তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ হল গামা রশ্মি। যদিও অনেক মহাজাগতিক গামা রশ্মির উৎস আছে, যাদের শক্তি (প্রাবল্য ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য উভয়েই) নিউক্লিয়াসের থেকে অনেক বেশি। প্রায়ই পার্টিকেল পদার্থবিদ্যায় এবং রেডিওথেরাপি দ্বারা চিকিৎসায় উচ্চশক্তির ই এম আর (EMR) (১০ মেগা ইলেক্ট্রন-ভোল্টের থেকেও বেশি) ব্যবহার করা হয়ে থাকে - যার শক্তি যেকোনো নিউক্লিয়াস থেকে সৃষ্ট গামা রশ্মি অপেক্ষা অনেক বেশি। একে তাই গামা রশ্মি বা রঞ্জন রশ্মি না বলে ‘উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটনের স্রোত’ বলা হয়ে থাকে।

একটি নির্দিষ্ট নিরীক্ষিত তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (বা কম্পাঙ্ক) প্রসঙ্গ কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ কোনো একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বলে বোধ হলেও আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগ সম্পন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে ঐ বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ভিন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ (cosmic microwave background radiation)। এটি সৃষ্টি হয় যখন হাইড্রোজেন পরমাণুর উচ্চশক্তিস্তর থেকে ভূমিস্তরে আসার মাধ্যমে পদার্থ ও বিকিরণের পৃথকীকরণ ঘটে। এই ফোটনের স্রোত 'লীম্যান - সিরিজ' (Lyman series) তৈরী করে (মূলত অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালী)। এরপর ঐ বিকিরণের মহাজাগতিক লোহিত সরণ ঘটে এবং আলোর গতিবেগের চেয়ে অনেক কম গতিবেগ সম্পন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে ঐ বিকিরণ অণুতরঙ্গ রূপে পর্যবেক্ষিত হয়।

বেতার তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ)

যে সকল তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১ মিলিমিটার থেকে ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে বেতার তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ বলে।

বেতার তরঙ্গ খালি চোখে দেখা যায় না। বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক দৃশ্যমান আলোর থেকে কম। এর কম্পাঙ্ক 3 KHz হতে 300 GHz পর্যন্ত। এই রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি (কম্পাঙ্ক) সাধারণত বেতার যোগাযোগে ব্যবহৃত হয় বলে একে রেডিও ওয়েভ বলা হয়। এটি বেতার বর্ণালী বা রেডিও বর্ণালী নামেও পরিচিত। 300 GHz এর উপরে গেলে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ শোষিত হয়ে যায়।

প্রচলিত অর্থে (এক্ষেত্রে রেডিও থেকে শুরু করে ইনফ্রারেড পর্যন্ত বর্ণালী ব্যান্ডের কম্পাঙ্ককে ধরা হয়) বেতার তরঙ্গের রেঞ্জ 30 Hz থেকে 300 GHz বা অনেক ক্ষেত্রে 3 THz পর্যন্ত হতে পারে। 300 GHz রেডিও তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1 mm (চালের দানার চেয়ে ছোট); আবার 30 Hz রেডিও তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10 km (যা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের চেয়েও দীর্ঘ)। বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই কম শক্তি সম্পন্ন হয় এবং অকল্পনীয় দুরত্ব পাড়ি দিতে পারে। অন্যান্য সব তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের মত বেতার তরঙ্গও আলোর গতিতে ভ্রমণ করে।

প্রাকৃতিক উপায়ে বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি হয় সাধারণত বজ্রপাত বা মহাজাগতিক বস্তু থেকে। কৃত্রিমভাবে তৈরীকৃত বেতার তরঙ্গ মোবাইল টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ, সম্প্রচার, রাডার ও অন্যান্য দিকনির্দেশনা (navigation) ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সহ অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ভিন্ন কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকম হয়। বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ পৃথিবীর একটি বড় অংশকে ঘিরে নিতে পারে, ছোট বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ আয়নমন্ডল দ্বারা প্রতিফলিত হতে পারে এবং অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ খুবই অল্প বাঁক নিতে পারে বলে শুধু দৃষ্টি রেখা (line of sight) বরাবর ভ্রমণ করতে পারে।

উপযুক্ত আকারের অ্যান্টেনা দ্বারা সাধারণত বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক শত মিটার থেকে এক মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘আইটিইউ’ (আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন) এর অনুমোদিত তরঙ্গ বন্টনের মাধ্যমে অনেক রাষ্ট্র বেতার তরঙ্গের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন বা ‘আইটিইউ’ টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম মান নির্ধারণের কাজ করে থাকে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে। এটি টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত প্রায় ২০০০ ধরনের মান নির্ধারণের কাজ করেছে।

১৮৬৫ সালের ১৭'ই মে ফ্রান্সের প্যারিসে আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন নামে এটি কাজ শুরু করে। মূলত এই সংস্থাটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সমঝোতার উপর ভিত্তি করে তৈরি মান অনুমোদন করে। তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর ক্ষুদ্রতম অংশকে ব্যান্ড বলা হয়। একাধিক ব্যবহারকারীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ ঠেকাতে 'আইটিইউ' কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিটি রাষ্ট্রের ব্যবহৃত বেতার ব্যান্ডেরই নিজস্ব তরঙ্গনীতি আছে।

মড্যুলেশন (Modulation) করে অর্থাৎ বেতার তরঙ্গের বিস্তার, দশা এবং কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে (নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক সীমার মধ্যে) এই তরঙ্গের সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। যখন তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ কোনো পরিবাহীর উপরে এসে পড়ে, তখন তা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং পরিবাহীর ইলেক্ট্রনকে উত্তেজিত করে পরিবাহীর উপরিতলে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ তৈরী করে। এই প্রক্রিয়া (আবরণী প্রভাব বা skin effect) অ্যান্টেনায় ব্যবহৃত হয়।

রেডিও কম্পাঙ্ক

রেডিও কম্পাঙ্ক বলতে 3 Hz থেকে 3 GHz পর্যন্ত কম্পাঙ্ক তথা স্পন্দনের হারকে বোঝায়। রেডিও তরঙ্গ উৎপাদন এবং সনাক্তকরণের জন্য পরিবর্তী প্রবাহ বৈদ্যুতিক সংকেতের যে কম্পাঙ্কগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোও এই রেডিও কম্পাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত। এদের স্পন্দন এমন যে যেকোন মেকানিকেল ব্যবস্থাই তার সংবেদনে সাড়া দিতে পারে। এ কারণেই তড়িৎ বর্তনী ও তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণে স্পন্দনের প্রতি নির্দেশ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

রেডিও কম্পাঙ্কের বিভাজনসমূহ এবং এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র

বেতার ব্যান্ডের নাম	প্রতীক	কম্পাঙ্ক	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	প্রয়োগ
এক্সট্রিমলি লো কম্পাঙ্ক	ELF	3 Hz to 30 Hz	10,000 km to 100,000 km	শব্দে রূপান্তর করা হলে সরাসরি শোনা যায়, সাবমেরিন যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়
সুপার লো কম্পাঙ্ক	SLF	30 Hz to 300 Hz	1,000 km to 10,000 km	শব্দে রূপান্তর করা হলে সরাসরি শোনা যায়, এসি শক্তি গ্রিড (৫০-৬০ হার্জ)
আল্ট্রা লো কম্পাঙ্ক	ULF	300 Hz to 3 KHz	100 km to 1,000 km	শব্দে রূপান্তর করা হলে সরাসরি শোনা যায়, খনিকার্যে ব্যবহার
ভেরি লো কম্পাঙ্ক	VLF	3 KHz to 30 kHz	10 km to 100 km	শব্দে রূপান্তর করা হলে সরাসরি শোনা যায়
লো কম্পাঙ্ক	LF	30 KHz to 300 kHz	1 km to 10 km	আন্তর্জাতিক সম্প্রচার, নেভিগেশন কাযে ব্যবহৃত বিকন, লোফার
মধ্যম কম্পাঙ্ক	MF	300 KHz to 3 MHz	10 m to 1 km	নেভিগেশনাল বিকন, এএম সম্প্রচার, সমুদ্র এবং এভিয়েশন
উচ্চ কম্পাঙ্ক	HF	3 MHz to 30 MHz	10 m to 100 m	শর্টওয়েভ, অ্যামেচার রেডিও, সিটিজেন্স ব্যান্ড রেডিও
ভেরি হাই কম্পাঙ্ক	VHF	30 MHz to 300 MHz	1 m to 10 m	এফএম সম্প্রচার, টেলিভিশন সম্প্রচার, এভিয়েশন, গ্রাউন্ড-পেনেট্রেটিং রাডার

বেতার ব্যান্ডের নাম	প্রতীক	কম্পাঙ্ক	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	প্রয়োগ
আল্ট্রা হাই কম্পাঙ্ক	UHF	300 MHz to 3 GHz	10 cm to 100 cm	টেলিভিশন সম্প্রচার, মোবাইল, বেতার নেটওয়ার্ক, গাড়ির রিমোট কিলেস এন্ট্রি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, গ্রাউন্ড-পেনেট্রেটিং রাডার (জিপিআর)
সুপার হাই কম্পাঙ্ক	SHF	3 GHz to 30 GHz	1 cm to 10 cm	বেতার নেটওয়ার্ক, উপগ্রহের সংযোগ, অণুতরঙ্গ সংযোগ, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, দরজা খোলার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা
এক্সট্রিমলি হাই কম্পাঙ্ক	EHF	30 GHz to 300 GHz	1 mm to 10 mm	অণুতরঙ্গ উপাত্ত সংযোগ, রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান, রিমোট সেন্সিং, অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক নিরাপত্তা স্ক্যান
ট্রিমেন্ডাস হাই ফ্রিকোয়েন্সি	THz অথবা THF	300 GHz to 3 THz	100 μm to 1 mm	এক্সরে'র বিকল্প হিসেবে পরীক্ষামূলক মেডিকেল ইমেজিং, অত্যন্ত দ্রুতগতির আণবিক ডায়নামিক্স (আল্ট্রাফাস্ট মলিকিউলার ডায়নামিক্স), কন্ডেন্সেড ম্যাটার ফিজিক্স, টেরাহার্টজ নির্ভর টাইম ডোমেইন স্পেকট্রোস্কপি, টেরাহার্টজ কম্পিউটিং বা কমিউনিকেশন্স, রিমোট সেনসিং, এ্যামেচার রেডিও বা শৌখিন বেতার যোগাযোগ

অণুতরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ)

যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১ মিলিমিটার থেকে ১ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে অণুতরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ বলে।

এদের কম্পাঙ্ক ৩০০ মেগাহার্জ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিটার) হতে ৩০০ গিগাহার্জ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মাইক্রোওয়েভ শব্দে 'মাইক্রো' উপসর্গটি মাইক্রোমিটার পাল্লার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ বোঝায় না এবং অণুতরঙ্গ শব্দে 'অণু' উপসর্গটি আণবিক আকৃতির তরঙ্গ প্রকাশ করে না, বরং উভয়ক্ষেত্রেই সাধারণ অর্থে 'ক্ষুদ্র তরঙ্গ' প্রকাশ করে, কারণ 'মাইক্রোওয়েভ' দ্বারা সংজ্ঞায়িত তরঙ্গগুলোর দৈর্ঘ্য সাধারণ বেতার সম্প্রচারে ব্যবহৃত তরঙ্গের দৈর্ঘ্যাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভের উৎস হিসেবে বিশেষ নির্বাতনল (ভ্যাক্যুয়াম টিউব) ব্যবহৃত হয়। নিয়ন্ত্রক তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত ইলেক্ট্রন কে শূন্যস্থানে প্রবাহ ঘটিয়ে মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টি করা হয়। তাতে আরও থাকে ম্যাগনেট্রন (মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্যবহৃত), ক্লাইস্ট্রন, চল-তরঙ্গ নল (traveling-wave tube বা TWT) এবং জাইরোট্রন।

অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভের উৎস হিসেবে ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (কম কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে), টানেল ডায়োড, গান ডায়োড (Gunn diode), ইমপ্যাট ডায়োড (IMPATT diode) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

সকল উষ্ণ বস্তু হতে কিছু মাইক্রোওয়েভ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ (black-body radiation) নির্গত হয়, যার পরিমাণ বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। এজন্য আবহাওয়া বিদ্যায় দূরপাল্লার মাইক্রোওয়েভ পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করে কোন বস্তু বা পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাপা হয়। নক্ষত্র হতে বিকিরিত দূর্বল মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে তাদের গঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ (cosmic microwave background radiation, সংক্ষেপে CMBR) বিশ্লেষণ করে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

অণুতরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্য

মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটি ট্রান্সসিভার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগনাল ট্রান্সমিট করার কাজে এবং অন্যটি সিগনাল রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোওয়েভ বিল্ডিং বা কোনো বাধা ভেদ করতে পারে না। তাই এ সিস্টেমে ব্যবহৃত অ্যান্টিনা বড় কোন ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগনাল বাধাহীনভাবে বেশি দূরত্বে পাঠানো যায়। মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না। তাই এ ওয়েভ পাঠানোর জন্য প্রেরক ও প্রাপক দৃষ্টি রেখার মধ্যে থাকতে হয়। মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে অনেক বেশি হওয়ায় এর পারফরমেন্স ও গতি বেশি পাওয়া গেলেও এ তরঙ্গ কুয়াশা বা বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে যায়। যা সাধারণত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে হয় না।

অণুতরঙ্গের ব্যবহার

- সেলুলার যোগাযোগ
- ডিশ টিভির সঙ্কেত বহনে
- ওয়াই ম্যাক্স (WiMax) যোগাযোগ ব্যবস্থায়
- বৈশ্বিক অবস্থান ব্যবস্থায় (জিপিএস GPS)
- আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে
- মাইক্রোওয়েভ ওভেন রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ ব্যবহার করে খাদ্যবস্তুর অভ্যন্তরীণ পোলারাইজড (polarized) অণুগুলোকে উত্তপ্ত করে, ফলে সম্পূর্ণ খাদ্যবস্তুটি গরম বা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অণুতরঙ্গের প্রকারভেদ

অণুতরঙ্গ ট্রান্সমিশনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. পার্থিব অণুতরঙ্গ (টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ)
2. উপগ্রহ অণুতরঙ্গ (স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ)

পার্থিব অণুতরঙ্গ বা টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ

মাইক্রোওয়েভের যে ট্রান্সমিশনে লাইন অফ সাইট ট্রান্সমিশন ঘটে থাকে। অথবা মাইক্রোওয়েভের যে ট্রান্সমিশন প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। তাকে পার্থিব অণুতরঙ্গ বা টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ বলে।

এ পদ্ধতিতে ট্রান্সমিটার ও রিসিভার দৃষ্টি রেখায় যোগাযোগ করে। মাঝখানে কোনো বাধা না থাকলে টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন সিগনাল ১ মাইল থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে।

টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য

- অল্প দূরত্বের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাইলে খরচ তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু বেশি দূরত্বের জন্য করতে গেলে বেশ ব্যয়বহুল হয়ে দাড়ায়।

- এ ট্রান্সমিশন লাইন অব সাইট ব্যবহার করে বলে ইনস্টলেশন কঠিন হয়ে দাড়ায়।

- ইনস্টলেশনের সময় নিশ্চিত করতে হবে যে দুই অ্যান্টেনার মাঝে কোনো বাধা নেই বা ভবিষ্যতে থাকবে না।

- ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সি, সিগন্যাল ও অ্যান্টেনার আকারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন মাত্রার এটিনুয়েশন দেখা দিতে পারে। কুয়াশা, বৃষ্টি ইত্যাদিও সিগনাল ট্রান্সমিশনে বাধা হয়ে দাড়ায়।

- মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনে EMI (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স) প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেই। সে কারণে এই ট্রান্সমিশন ইভসড্রপিঙের শিকার হতে পারে। তবে অনেক মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনে এনক্রিপশন ব্যবহার করে ডেটা সুরক্ষিত রাখা হয়। EMI এর পাশাপাশি আবহাওয়ার কারণেও মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন বিঘ্নিত হতে পারে।

উপগ্রহ অণুতরঙ্গ বা স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

মাইক্রোওয়েভের যে ট্রান্সমিশনে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইটে সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়ে থাকে অথবা মাইক্রোওয়েভের যে ট্রান্সমিশন প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের ট্রান্সমিটার তথা স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা থেকে মহাশূন্যের স্যাটেলাইটে সিগন্যাল প্রেরণ করা হয় তাকে উপগ্রহ অণুতরঙ্গ বা স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ বলে।

এক্ষেত্রে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ভূ-পৃষ্ঠে থাকে স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা এবং মহাশুন্যে থাকে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা বা ট্রান্সমিটারগুলো স্যাটেলাইটকে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল প্রেরণ করে। স্যাটেলাইটে পাঠানোর পর এই সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। স্যাটেলাইটে অনেকগুলো ট্রান্সপোন্ডার থাকে যা ক্ষীণ সংকেতকে অ্যামপ্লিফাই করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে পাঠিয়ে দেয়।

স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ মহাকাশে অবস্থান করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীকেই কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। স্যাটেলাইটকে মহাকাশে রাখার জন্য কোনো জ্বালানী বা শক্তি খরচ করতে হয় না। কারণ স্যাটেলাইটে মাইক্রোওয়েভের ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলো চালানোর জন্য সোলার পাওয়ার ব্যবহৃত হয়। পৃথিবী তার অক্ষে চব্বিশ ঘন্টায় ঘুরে আসে, স্যাটেলাইটকেও যদি ঠিক চব্বিশ ঘন্টায় একবার ঘুরিয়ে আনা যায় তাহলে পৃথিবী থেকে মনে হবে সেটা বুঝি আকাশের কোনো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এ ধরনের স্যাটেলাইটকে বলে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট। যেকোনো উচ্চতায় জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট রাখা যায় না। এটা রাখার জন্য ৩৪ হাজার কিলোমিটার উপরে একটা নির্দিষ্ট কক্ষ পথে রাখতে হয়। প্রতিটি স্যাটেলাইট এর বেসিক উপাদানগুলো হলো প্রাপক ও প্রাপক এন্টেনা, প্রেরক ও প্রেরক এন্টেনা এবং এই ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রগুলো চালানোর জন্য প্রয়োজন পাওয়ার, যা সোলার প্যানেলের মাধ্যমে জেনারেশন করা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে অবস্থিত এই স্টেশনগুলোতে শক্তিশালী এন্টেনা থাকে যার নাম VSAT। আকাশে একবার জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট বসানো হলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে প্রেরক যন্ত্র সেকেন্ডে প্রায় ৬০০ কোটি বা তার কাছাকাছি বার কম্পন বিশিষ্ট মাইক্রোওয়েভ সংকেত স্যাটেলাইটে পাঠায়। স্যাটেলাইটে পাঠানোর পর এই সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। স্যাটেলাইটে অনেকগুলো ট্রান্সপোন্ডার থাকে। এই ট্রান্সপোন্ডার ক্ষীণ সংকেতকে অ্যামপ্লিফায়ার এর মাধ্যমে অ্যামপ্লিফাই করে ৪০০ কোটিবার কম্পন বিশিষ্ট সংকেতে পরিণত করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে ফেরত পাঠায়। এভাবে দুইটি VSAT এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। VSAT এর অ্যান্টেনাকে এমন দিকে রাখতে হয় যাতে তা সবসময় স্যাটেলাইটের দিকে নির্দেশ করে থাকে। স্যাটেলাইটগুলো অনেক দূরে অবস্থিত থাকার কারণে অধিক শক্তিতে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করতে হয়। স্যাটেলাইট একটি মাইক্রোওয়েভ রিপিটার হিসাবে কাজ করে। এধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় পৃথিবীতে অনেকগুলো মাইক্রোওয়েভ প্রেরক বা গ্রহীতা থাকে। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে ল্যানের কোনো কম্পিউটার ক্যাবলের মাধ্যমে সিগনাল পাঠায় অ্যান্টেনা বা স্যাটেলাইট ডিশের কাছে আর স্যাটেলাইট ডিশ সেই সিগনাল বীম পাঠায় পৃথিবীর অক্ষে অবস্থিত স্যাটেলাইটের নিকট। সেই স্যাটেলাইট তখন ভূপৃষ্ঠের অন্য কোনো স্যাটেলাইট ডিশের নিকট পাঠিয়ে দেয়। গন্তব্য স্যাটেলাইট ডিশ যদি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে থাকে কিংবা স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি সেটিকে দেখা না যায় তাহলে সেই স্যাটেলাইট ওই সিগনালকে অন্য স্যাটেলাইটের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় স্যাটেলাইট যদি গন্তব্য স্যাটেলাইট ডিশকে দেখতে পায় তাহলে সেই সিগনালকে গন্তব্যে পৌছে দেয়।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য

স্যাটেলাইটটি পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে তাই সেখানে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য অনেক বড় অ্যান্টেনার দরকার হয়। পৃথিবী থেকে যে সিগনাল পাঠানো হয় সেটি ওয়ারলেস সিগনাল এবং যদিও সেটি আলোর বেগে যায় তারপরেও এই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে একটু সময় নেয়। ফলে ধীর গতিতে ডেটা আদান প্রদান করে। তাই টেলিফোনে কথা বললে অন্য পাশ থেকে কথাটি সাথে সাথে না শুনে একটু পরে শোনা যায়।

এতে বেশ উচ্চমাত্রার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয়। এর ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত ১১ থেকে ১৪ গিগাহার্টজ হয়ে থাকে। স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের ব্যয় অত্যাধিক। খুব বড় ধরনের নেটওয়ার্ক না হলে এবং একান্তই দরকার হলে এ ধরনের নেটওয়ার্ক কেউ ব্যবহার করে না। তবে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যে কভারেজ দেয়া যায় সেখানে ক্যাবল ইনস্টল করতে গেলে অনেক গুণ বেশি ব্যয় হবে। এ ধরনের ইনস্টলেশন সত্যিই বেশ কঠিন এবং এটি কেবল বহু বছরের অভিজ্ঞ লোকের হাতেই দেয়া যেতে পারে। এটি এটিনুয়েশনের শিকার হতে পারে। কুয়াশা, বৃষ্টি ও প্রতিকুল আবহাওয়া এই ট্রান্সমিশনকে বিঘ্নিত করতে পারে। এ ট্রান্সমিশনে EMI প্রভাব ফেলে এবং এতে ইভসড্রপিঙের সম্ভাবনা থাকে।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার

- পৃথিবীর যেকোনো দুটি প্রান্তে কম খরচে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা যায়।
- টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার করতে পারে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করার জন্য স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করা যায়।
- আন্তঃমহাদেশীয় দূরবর্তী টেলিফোন কলের জন্য স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়।
- আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে স্যাটেলাইট ব্যবহার করা যায়।
- স্যাটেলাইট এর সাহায্যে GPS যেকোনো স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করে দেয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

অণুতরঙ্গ কম্পাঙ্ক

যে সকল তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের কম্পাঙ্কের সীমা 300 MHz থেকে 300 GHz পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে অণুতরঙ্গ কম্পাঙ্ক বলে।

অণুতরঙ্গ কম্পাঙ্কের প্রকারভেদ

অণুতরঙ্গ কম্পাঙ্ককে (Microwave frequency) তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

1. অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক (Ultra High Frequency, সংক্ষেপে UHF)
2. অধি উচ্চ কম্পাঙ্ক (Super High Frequency, সংক্ষেপে SHF)
3. অত্যন্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক (Extremly High Frequency, সংক্ষেপে EHF)

অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক বা Ultra High Frequency (UHF)

যে সকল তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের কম্পাঙ্কের সীমা 300 Hz থেকে 3 GHz পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক বা (Ultra High Frequency (UHF) বলে।

এ কম্পাঙ্কের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা 10 cm হতে 100 cm পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণত টেলিভিশন সম্প্রচার, মোবাইল, বেতার নেটওয়ার্ক, গাড়ির রিমোট কিলেস এন্ট্রি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, গ্রাউন্ড-পেনেট্রেটিং রাডার (জিপিআর) সিস্টেমে এ কম্পাঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

অধি উচ্চ কম্পাঙ্ক বা Super High Frequency (SHF)

যে সকল তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের কম্পাঙ্কের সীমা 3 GHz থেকে 30 GHz পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে অধি উচ্চ কম্পাঙ্ক বা Super High Frequency (SHF) বলে।

এ কম্পাঙ্কের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা 1 cm হতে 10 cm পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণত বেতার নেটওয়ার্ক, উপগ্রহের সংযোগ, অণুতরঙ্গ সংযোগ, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, দরজা খোলার স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে এ কম্পাঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

অত্যন্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক বা Extremly High Frequency (EHF)

যে সকল তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের কম্পাঙ্কের সীমা 30 GHz থেকে 300 GHz পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে অত্যন্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক বা Extremly High Frequency (EHF) বলে।

এ কম্পাঙ্কের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা 1 mm হতে 1 cm পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণত অণুতরঙ্গ উপাত্ত সংযোগ, রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান, রিমোট সেন্সিং, অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক নিরাপত্তা স্ক্যান পদ্ধতিতে এ কম্পাঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

টেরাহার্টজ বিকিরণ

যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ০.১ মিমি (১০০ μm) থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে টেরাহার্টজ বিকিরণ বলে। (১ টেরাহার্টজ = $১০^{১২}$ হার্টজ)

দূরবর্তী অবলোহিত বিকিরণ এবং অণুতরঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বর্ণালীই হল টেরাহার্জ বিকিরণ। একে সাবমিলিমিটার বিকিরণ, টেরাহার্জ তরঙ্গ, বিশাল উচ্চমানের তরঙ্গ, টি-রশ্মি, টি-তরঙ্গ, টি-আলোক, টি-লাক্স অথবা টি-হার্জ নামেও অভিহিত করা হয়। এদের কম্পাঙ্ক ০.৩ টেরাহার্টজ থেকে ৩ টেরাহার্টজ পর্যন্ত। যেহেতু টেরাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিমি থেকে শুরু করে নিচে নামতে থাকে তাই জ্যোতির্বিদ্যায় একে সাবমিলিমিটার ব্যান্ডও বলা হয় এবং এর বিকিরণকে বলা হয় সাবমিলিমিটার তরঙ্গ।

টেরাহার্জ বিকিরণ মাইক্রওয়েভ এবং অবলোহিত বিকিরণের মাঝে অবস্থান করে যা টেরাহার্জ গ্যাপ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর এমন একটি অংশে বিদ্যমান যেখানে তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ এতই বেশি মাত্রার যে তা ইলেকট্রনিক কাউন্টার দ্বারা মাপা সম্ভব হয় না, বরং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি দিয়ে মাপা হয়। একইভাবে, সুসঙ্গত তড়িৎ চৌম্বকীয় সিগন্যালের উৎপাদন এবং তার ব্যবহার, প্রচলিত বেতার এবং মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল উৎপাদনকারী ইলেকট্রনিক যন্ত্র দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই তার জন্য নতুন প্রযুক্তি এবং যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। টেরাহার্টজ অঞ্চলের ফোটন শক্তি অধাতব বস্তুর মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম।

টেরাহার্টজ বিকিরণের বৈশিষ্ট্য

টেরাহার্জ বিকিরণ তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর অবলোহিত বিকিরণ এবং মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের মধ্যে পড়ে, তাই এতে উভয় বিকিরণেরই কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

অবলোহিত এবং মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের মতো টেরাহার্টজ বিকিরণ দৃশ্যমান এবং আয়নিত নয়। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের মতো টেরাহার্টজ বিকিরণ বিভিন্ন ধরনের অপরিবাহী পদার্থ ভেদ করতে সক্ষম। টেরাহার্জ বিকিরণ পোশাক, কাগজ, পিচবোর্ড, কাঠ, গাঁথনি, প্লাস্টিক ও সিরামিক ভেদ করতে পারে। এর ভেদন ক্ষমতা সাধারণত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের চেয়ে কম। কুয়াশা এবং মেঘের মধ্যে টেরাহার্টজ রশ্মির অনুপ্রবেশ সীমিত। এ রশ্মি পানি বা ধাতুকে ভেদ করতে পারে না। এ রশ্মি আয়োনাইজিং না হওয়া সত্ত্বেও শরীরের টিস্যুর কিছু দূরত্ব ভেদ করতে পারে, তাই এটি চিকিৎসাক্ষেত্রে এক্স-রে এর জন্য একটি প্রতিস্থাপন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। টেরাহার্টজ রশ্মি দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হওয়ায় এর দ্বারা তৈরি ছবি খুব স্বল্প রেজল্যুশনের হয়।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প দ্বারা টেরাহার্টজ ব্যান্ডের শক্তি শোষিত হওয়ায় এর পরিসীমা যথেষ্ট সীমিত। তাই দূরবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ রশ্মি অনুপযোগী। তবে প্রায় ১০ মিটার দূরত্বে মধ্যে টেরাহার্টজ রশ্মি ইমেজিং এবং উচ্চ ব্যান্ডউইথ ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, বিশেষত অন্দর সিস্টেম নির্মাণের অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টেরাহার্টজ বিকিরণের ব্যবহার

আগে এই বর্ণালীর উপর বিশেষ গবেষণা হয়নি, তবে বর্তমানে ইমেজিং এবং সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ রশ্মি বস্তুর বৈশিষ্ট্যকরণ, স্তর পর্যবেক্ষণ এবং ট্রান্সমিশন ছবি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এখন বিজ্ঞানীরা টেরাহার্টজ প্রযুক্তিকে সামরিক বাহিনীর কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে, যেখানে উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ শত্রু শিবিরের দিকে প্রক্ষেপ করে তাদের ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র নষ্ট করা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যায় টেরাহার্টজ তরঙ্গ উচ্চ চুম্বকীয় ক্ষেত্রে থাকা বস্তুকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। শিল্পের কোনো ক্ষতি ছাড়াই টেরাহার্টজ বিকিরণ শিল্প ঐতিহাসিকদের প্লাস্টার বা শতায়ু বাড়ীর রঙ এর তলদেশে লুকানো ম্যুরাল দেখতে সাহায্য করে। টেরাহার্জ বিকিরণ কাপড় এবং প্লাস্টিক ভেদ করতে পারে, তাই এটি নিরাপত্তাজনিত কাজে যেমন ব্যক্তির সাথে থাকা গোপন অস্ত্র উন্মোচিত করার, নিরাপত্তা নির্ণয়ে দূরবর্তী স্থান থেকেও নজরদারিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া এর মাধ্যমে প্যাকেজ পণ্য পরিদর্শন করা সম্ভব।

ইনফ্রারেড বা অবলোহিত বিকিরণ

যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১ মাইক্রোমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের বলা হয় অবলোহিত বিকিরণ (আইআর) রশ্মি।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর অবলোহিত তরঙ্গের কম্পাঙ্কের বিস্তার মোটামুটি ৩০০ গিগা-হার্টজ থেকে ৪০০ টেরা-হার্টজ পর্যন্ত।

এই বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা সামান্য বড়। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। উইলিয়াম হার্শেল ১৮০০ সালে এই বিকিরণ আবিষ্কার করেন। উত্তপ্ত সিরামিক এর একটি উত্তম উৎস। এটি দৃশ্যমান অঞ্চল হতে অর্থাৎ visible বা 'infra' এর পর থেকেই শুরু।

অবলোহিত রশ্মির প্রকারভেদ

- এফআইআর বা দূরবর্তি আইআর বা দূরবর্তী অবলোহিত
- এমআইআর বা মধ্য আইআর বা মধ্য অবলোহিত
- এনআইআর বা সন্নিকট আইআর বা সন্নিকট অবলোহিত
- টিআইআর বা তাপীয় আইআর বা তাপীয় অবলোহিত

দূরবর্তী অবলোহিত

কম্পাঙ্কের বিস্তার মোটামুটি ৩০০ গিগাহার্টজ থেকে ৩০ টেরাহার্টজ পর্যন্ত (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার থেকে ১০ মাইক্রোমিটার)। এই তরঙ্গ সাধারণত গ্যাসীয় অবস্থায় অণুর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার দ্বারা, তরল অবস্থায় অণুর গতি প্রক্রিয়ার দ্বারা, এবং কঠিন অবস্থায় ফোনন (phonons) দ্বারা বিশোষিত হয়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের জলকণা এই বর্ণালী এত বেশি শোষণ করে যে, এই বর্ণালীর পরিপ্রক্ষিতে বায়ুমন্ডল অস্বচ্ছ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এই অস্বচ্ছ অঞ্চলের মধ্যেও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল আছে যেখানে তরঙ্গের আংশিক সঞ্চারণ সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই অঞ্চলের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ২০০ মাইক্রোমিটার থেকে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় সাবমিলিমিটার (sub-millimeter) তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে।

মধ্য অবলোহিত

কম্পাঙ্কের বিস্তার ৩০ টেরাহার্টজ থেকে ১২০ টেরাহার্টজ পর্যন্ত (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০ মাইক্রোমিটার থেকে ২.৫ মাইক্রোমিটার)। উত্তপ্ত পদার্থ (কৃষ্ণবস্তু বিকিরক) এই বিকিরণ করে থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের শরীর থেকে এই অঞ্চলের শেষ প্রান্তের তরঙ্গ বিকিরিত হয়। এই বিকিরণ অণুর কম্পন দ্বারা বিশোষিত হয়। যেখানে অণুর মধ্যে থাকা বিভিন্ন ধরনের পরমাণুগুলি তাদের সুস্থিতি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কম্পিত হয়। এই অঞ্চলকে অনেক সময় ফিঙ্গারপ্রিন্ট অঞ্চল (fingerprint region) বলা হয়ে থাকে, কারণ কোনো ব্যক্তির আঙুলের ছাপ যেমন খুবই স্বতন্ত্র, তেমনি কোনো পদার্থের মধ্য অবলোহিত অঞ্চলের শোষণ বর্ণালী তার সুস্থিতি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই সুনির্দিষ্ট।

সন্নিকট অবলোহিত

কম্পাঙ্কের বিস্তার ১২০ টেরাহার্টজ থেকে ৪০০ টেরাহার্টজ পর্যন্ত (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২৫০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭৫০ ন্যানোমিটার)। এই অঞ্চলের প্রাসঙ্গিক ভৌত প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে দৃশ্যমান আলো বর্ণালীর প্রাসঙ্গিক ভৌত প্রক্রিয়াগুলির অনেক মিল দেখা যায়। কয়েক প্রকার ফটোগ্রাফিক ফিল্ম দ্বারা এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক শনাক্ত করা যায়। এছাড়াও অনেক প্রকার সলিড স্টেট (Solid State) ইমেজ সেন্সর (image sensor) ইনফ্রারেড ফোটোগ্রাফি (infrared photography) এবং ভিডিওগ্রাফির (videography) কাজে ব্যবহৃত হয়।

তাপীয় অবলোহিত

তাপ হলো পদার্থের অণুগুলোর গতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন এক প্রকার শক্তি, যা কোনো বস্তু ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়। প্রকৃতপক্ষে, তাপ পদার্থের অণুগুলোর এলোমেলো গতির ফল। পদার্থের অণুগুলো সবসময় গতিশীল অবস্থায় থাকে। কোনো পদার্থের মোট তাপের পরিমাণ এর মধ্যস্থিত অণুগুলোর মোট গতিশক্তির সমানুপাতিক। কোনো বস্তুতে তাপ প্রদান করা হলে এর অণুগুলোর ছোটাছুটি বৃদ্ধি পায়, ফলে এর গতিশক্তিও বেড়ে যায়। তাপ ও তাপমাত্রা একই বিষয় নয়। তাপমাত্রা হচ্ছে কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করে ঐ বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসলে তাপ গ্রহণ করবে নাকি বর্জন করবে। সাধারণত উষ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়।

তাপমাত্রার পার্থক্যজনিত কারণে তিনটি পদ্ধতিতে তথা পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপশক্তি গমন করে। এক্ষেত্রে তাপীয় বিকিরণ, যা প্রায়ই ইনফ্রারেড বিকিরণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ বিকিরণের ক্ষেত্রে তাপ সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি।

উত্তপ্ত যে কোনো বস্তুই আলো বিকিরণ করে। তথা কোনো বস্তুর তাপমাত্রা শুন্য কেলভিন এর বেশি হলেই সেখান থেকে ইনফ্রারেড রশ্মি আকারে তাপ নির্গত হয়। তা সে আকাশের কোনো নক্ষত্র হোক অথবা আমাদের চারপাশের সাধারণ বস্তুই হোক। এমনকি ৯৮° ফারেনহাইট তাপমাত্রার মানবদেহ থেকেও আলোক তরঙ্গ নিঃসৃত হয়। কোনো বস্তু থেকে কি পরিমান তাপ নির্গত হবে তা নির্ভর করে বস্তুটির তাপমাত্রার উপর। বিকীর্ণ তাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরষ্পর ব্যস্তানুপাতিক।

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$$

এখানে, λ ও T হচ্ছে যথাক্রমে ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বস্তুর তাপমাত্রা। এবং b হচ্ছে ভীনের ধ্রুবক যার মান 2.8977729×10^{-3} mK

যে বস্তু যত বেশি উষ্ণ সে বস্তু তত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিকিরন করে। সূর্য থেকে বিকিরিত তাপ ০.২ মাইক্রোমিটার থেকে ০.৪ মাইক্রোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে পৃথিবী পৃষ্টে এসে পৌঁছায়। সৌর বিকিরনে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন সৌর বিকিরণে ৮% অতিবেগুনি রশ্মি, ৫০% দৃশ্যমান রশ্মি এবং ৪২% ইনফ্রারেড বা লাল রশ্মি থাকে। সূর্য থেকে আগত শক্তির বেশ কিছু অংশ পৃথিবী পৃষ্টকে উত্তপ্ত না করেই মহাশূন্যে ফিরে যায়, একে অ্যালবেডো বলে। পৃথিবীর অ্যালবেডোর পরিমান ৩৫%। নিম্নস্তরের ঘন কালো মেঘ, বালি, তুষার প্রভৃতি থেকে অ্যালবেডো বেশি হয়।

অবলোহিত রশ্মির প্রয়োগ

রসায়ন বিজ্ঞানে

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের কম্পন ব্যান্ড থেকে বিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা ও বিক্রিয়ার হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আবার কোন পদার্থের দ্রবণে ঘনমাত্রা নির্ণয়েও অবলোহিত রশ্মি বা বর্নালি ব্যবহার করা হয়। জৈব-অজৈব যৌগের গঠন নির্ণয়ে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম ১৯৫৬ সালে বক্ষ ক্যান্সার সনাক্তকরণের মাধ্যমে শুরু হয়। ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ এর অস্থান ও বিস্তৃতি সনাক্তকরণের জন্য আইআর রশ্মি ব্যবহার করা হয়। সন্নিকট আইআর রশ্মি দ্বারা রক্তের হিমোগ্লোবিন এ অক্সিজেন পরিমাপ করে মস্তিষ্কে রোগ নির্ণয় করা হয়। মূলত সদ্য প্রসূত শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষত নির্ণয়ে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ফিজিওথেরাপিতে

শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ব্যাথা, মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া, ঘাড় ও হাতের উপরিভাগের ব্যাথা বা ফ্রোজেন সোল্ডার এর ব্যাথা নিরাময়ে আক্রান্ত স্থানে আইআর রশ্মি প্রয়োগ করে ম্যাসাজ করা হয়। যার ফলে আক্রান্ত স্থানে রক্ত চলাচল সচল হয় এবং ব্যাথা প্রশমিত হয়। এই রশ্মির প্রভাবে রক্ত সংবহন এবং কোষের জৈবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এটি সমস্ত দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি না করে ত্বকের প্রয়োজনীয় জায়গায় তাপ বৃদ্ধি করে এবং ত্বকে শিথিলতা আনে। রক্তনালী গুলোকে প্রশস্ত করে এবং ত্বকে রক্ত পরিবহনের মাত্রা বৃদ্ধি করে ত্বকের কোষ কলাকে উদ্দীপ্ত করে। কোষ কলার মেটাবলিজম বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ও ত্বকের রাসায়নিক পরিবর্তনে সাহায্য করে। যেহেতু এই রশ্মি ত্বকের গভীরে পৌঁছে ফলে ত্বকের সেই অংশটুকুতে সামান্য গরম ও আরাম অনুভূত হয়, রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে ব্যাথা-বেদনা দূর হয়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়

আইআর সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম যেকোনো মুভমেন্ট শনাক্ত করে অ্যালার্ম বাজাতে পারে। এই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাংক, হাসপাতাল, অফিস, বাসাবাড়ি বা যেকোনো স্থানে ব্যবহারযোগ্য। সাধারণত আইআর এলইডি এর রেঞ্জ ২ মিটার। তবে একে লেন্স দ্বারা বিবর্ধিত করা যায়। আইআর ডায়োড মানব চোখে অদৃশ্য হওয়ায় এটা তুলনামূলক বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্ধকারে ছবি তোলার ক্ষেত্রে বা থার্মাল ইমেজ তৈরীর জন্য ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়।

তথ্য আদান প্রদানে

মোবাইল ফোনে কিছুদিন আগেও অবলোহিত রশ্মি দিয়ে তথ্য আদান-প্রদান করা হত। টিভি, সিডি প্লেয়ার, মিউজিক সিস্টেম সহ যাবতীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের রিমোট কন্ট্রোলে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করে ডেটা স্থানান্তর পদ্ধতি

ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম

যার মধ্য দিয়ে উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা বা তথ্য ট্রান্সমিশন বা স্থানান্তরিত হয় তাকে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Data Communication Medium) বলে।

যখন কেউ যোগাযোগ করে বা করতে চায় তখন তাকে কোনো না কোনো ট্রান্সমিশন মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়।

ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমের প্রকারভেদ

বহুল ব্যবহৃত হয় এমন ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম দুই ধরনের। যথা–

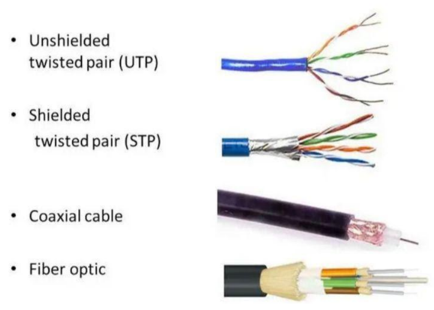
1. ক্যাবল মিডিয়া বা তার মাধ্যম (Wire Medium)
2. আনগাইডেড মিডিয়া বা তারবিহীন বা বেতার মাধ্যম (Wireless Medium)

তার মাধ্যম (Wire Medium)

ক্যাবল বা তার সংযোগের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তর করার মাধ্যমকে তারযুক্ত মিডিয়া বলে।

তারযুক্ত মিডিয়া খুব দ্রুত ডেটা স্থানান্তর বা সরবরাহ করতে পারে। এটি দীর্ঘ দূরত্বে সিগন্যালের উচ্চ গতির স্থানান্তর এবং বার্তার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিডিয়া হিসেবে পরিচিত।

তার মাধ্যমের প্রকারভেদ



সাধারণত তিন ধরণের তারযুক্ত ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া বা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়। যথা—

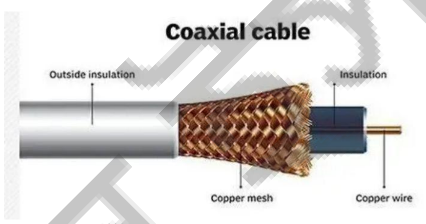
1. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Coaxial Cable)
2. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted-Pair Cable)
3. ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

কো-এক্সিয়াল কেবলটি তামা ভিত্তিক তারের কেবল। এটি ১৮৮০ সালে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এটি চারটি পৃথক স্তর সমন্বয়ে গঠিত। চারটি পৃথক স্তর হলো—

1. Centre core
2. Dielectric Insulator
3. Metallic Shield
4. Plastic Jacket

অর্থাৎ কোক্সিয়াল ক্যাবলের কেন্দ্রস্থলে একটি সলিড কপার তার থাকে, এই তারটিকে ঘিরে আবার অপরিবাহী প্লাস্টিক ফোমের ইনস্যুলেশন রয়েছে। ইনস্যুলেশন এর চারপাশে আবার জাল বা নেট আকৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং সবার বাইরে প্লাস্টিকের জ্যাকেট দিয়ে ঢাকা থাকে।



কো-এক্সিয়াল (coaxial) ক্যাবল ইন্টারনেট লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়, যাকে সংক্ষেপে কোক্স (coax) বলা হয়ে থাকে। এ ক্যাবল সাধারণত টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট সংকেত প্রেরণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সাইজের কো-এক্সিয়াল ক্যাবল পাওয়া যায়। এর সাইজকে RG দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং AC বা DC কারেন্টে এই ক্যাবলের রোধক্ষমতা (resistance) দিয়ে একে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বর্তমান নেটওয়ার্কিং -এ ব্যবহৃত এরকম কিছু কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো—

- ৫০ ওহম, RG-8 ও RG-11 ক্যাবল যা থিক ইথারনেটে ব্যবহৃত হয়।
- ৫০ ওহম, RG-58, যা থিন ইথারনেটে ব্যবহৃত হয়।
- ৭৫ ওহম, RG-59, এটি ক্যাবল টিভিতে ব্যবহৃত হয় (ডিশের লাইন টানা হয় এই ক্যাবল দিয়ে)।
- ৯৩ ওহম, RG-62, এই ক্যাবল ব্যবহৃত হয় আর্কনেটে।

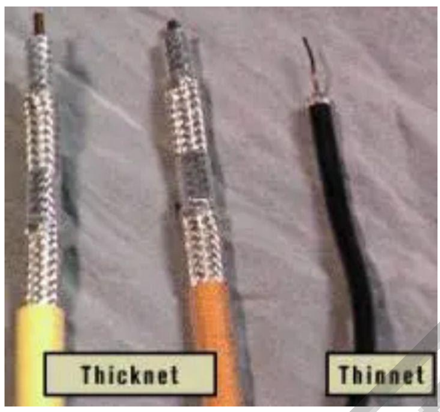
নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কো-এক্সিয়াল ক্যাবল প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

1. থিন কো-এক্সিয়াল
2. থিক কো-এক্সিয়াল

এসব ক্যাবল ব্যবহার করে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় থিননেট ও থিকনেট।

থিননেট বা থিন ইথারনেট

এ ক্যাবলের ব্যাস ০.২৫ ইঞ্চি এবং রিপিটার ছাড়া ১৮৫ পর্যন্ত ডেটা পাঠাতে পারে। একে 10 base 2 বলা হয়। এখানে ১০ হচ্ছে ব্যান্ডউইথ (10 MBPS) আর ২ হচ্ছে ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (২০০ মিটার)। বাস্তবে ২০০ মিটার ক্যাবল ব্যবহার করা না গেলে বুঝার সুবিধার জন্য ২ ব্যবহার করা হয়।



থিকনেট বা থিক ইথারনেট

এটি রিপিটার ছাড়া ৫০০ মিটার পর্যন্ত দুরত্বে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। একে 10 base 5 বলা হয়। এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট তথা ব্যান্ডউইথ 100 MBPS হতে 2 GBPS পর্যন্ত হতে পারে।

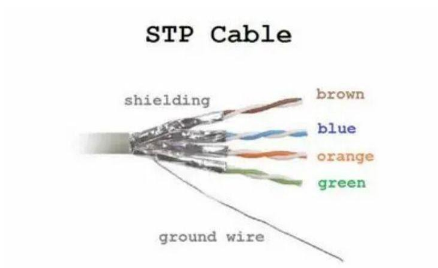
টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল হলো দুটি স্বতন্ত্রভাবে অন্তরক তারের সমন্বয়ে একে অপরের চারদিকে মোচড় দিয়ে মোড়ানো। এ ক্যাবলটিতে চার জোড়া তার একসাথে থাকে এবং প্রতিটি জোড়ার একটি কমন রং হলো সাদা এবং বাকি তারগুলো আলাদা বা ভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। এ ক্যবলের তারগুলোকে পৃথক করার জন্য এদের মাঝে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

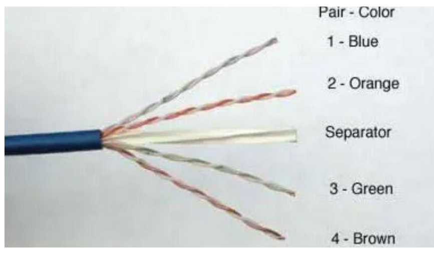
টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে একসাথে কয়েক জোড়া ক্যাবল পাকানো অবস্থায় থাকে যার মধ্য দিয়ে ডাটা সিগন্যাল প্রবাহিত হয়। এ ধরনের ক্যাবলই সাধারণত টেলিকমিউনিকেশন এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তামার তার একটি আরেকটির কাছে থাকলে একটির সিগন্যাল আরেকটির সিগন্যালকে প্রভাবিত করে যাকে বলা হয় ক্রসটক (cross-talk)। ক্রসটক এবং অন্যান্য ইন্টারফেরেন্স কমাতে তারগুলিকে পাকানো হয়। তারকে পাকানো হলে একটির সিগন্যাল আরেকটির সিগন্যালকে নিউট্রাল করে দেয়। টুইস্টেড পেয়ারে কালার কোডিং ব্যবদ্ধত হয় এবং প্রতিটি তারে একটি করে ইনসুলেশন বা আচ্ছাদন থাকে। এসব আচ্ছাদিত তারকে টুইস্ট করা বা পাকানো হয়। পাকানে তারের জোড়াকে আবার প্লাস্টিক জ্যাকেটে মোড়ানো হয় সুরক্ষিত করার জন্য।

ট্যুইস্টেড-পেয়ার কেবলটি পুরোনো টেলিফোন নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি অল্প ব্যয়ের মাধ্যমে কম দূরত্বের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দু'ধরনের—

1. শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার (ST)
2. আনশিল্ডেড ট্যুইস্টেড পেয়ার (UTP)



শিল্ডেড ট্যুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে প্রতিটি ট্যুইস্ট জোড় থাকে একটি করে শিল্ড বা শক্ত আচ্ছাদনের ভেতর। এর ফলে সেই তার অনেক সুরক্ষিত এবং EMI অনেক কম হয়। এই শিল্ড সাধারণত এলুমিনিয়াম বা পলিয়েস্টারের হয়ে থাকে। প্রতিটি শিল্ডেড পেয়ার আবার প্লাস্টিক জ্যাকেটের মাঝে থাকে।



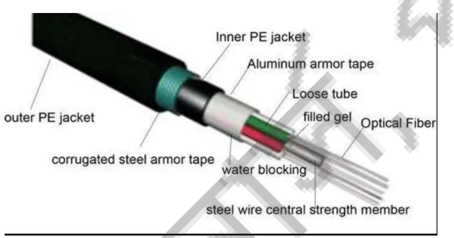
অপরদিকে আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে পেয়ারের বাইরে অতিরিক্ত কোনো শিল্ডিং থাকে না, কেবল সবকটি পেয়ারের বাইরে থাকে প্লাস্টিক জ্যাকেট। আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার বা UTP ক্যাবল সাধারণত টেলিফোন সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল

ফাইবার অপটিক ক্যাবল এক ধরনের কাচের তন্তু দ্বারা গঠিত যেখানে আলোর গতিতে ডেটা বা তথ্য আদান প্রদান করা যায়। অপটিকাল ফাইবার আলোর মাধ্যমে তথ্য বা ডেট প্রেরণ করে, যেখানে আলোক সংকেত ডেটা হিসাবে ডিকোড করা হয়। অর্থাৎ, ফাইবার অপটিক একটি এমন মাধ্যম যেটা খুব বেশি গতিতে দীর্ঘ দূরত্বে সংকেত বহন করার একটি পাইপ হিসেবে কাজ করে।

ফাইবার অপটিক্স সাধারণত টেলিযোগাযোগ সেবা যেমন ইন্টারনেট, টেলিভিশন এবং টেলিফোন গুলোতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফাইবার অপটিকের মধ্যে আলোক সংকেত দু'ভাবে যেতে পারে। লেজার (laser) এবং লেড (light-emitting diode)। ফাইবার অপটিক ক্যাবলে লেজার কাঙ্ক্ষিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেড ব্যবহৃত হয়। কারণ লেজার ডিভাইসের চেয়ে লেড ডিভাইস গুলোর ব্যয় কম, টেকেও অনেক বেশি। ফাইবার অপটিক ক্যাবলে কেন্দ্রের মূল তারটি গড়ে ওঠে সিলিকা, কাচ অথবা প্লাস্টিক দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে আলোক সংকেতরূপে ডাটা পরিবাহিত হতে পারে সিগন্যাল লস ছাড়াই। একটি মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ডায়ামিটার হলো ১২৫ মাইক্রন যা মানুষের দু'টো চুলের সমান মোটা। কেন্দ্রের অপটিক্যাল ফাইবারকে আচ্ছাদিত করে আছে ক্ল্যাডিং (cladding) বা কেবলার (kevlar), যা এমন এক পদার্থ দিয়ে তৈরি যে আলোক প্রতিফলন করতে পারে। এর ফলে আলোক সংকেত ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মধ্য দিয়ে বাঁকা পথে যেতে পারে। এরপর থাকে ইনসুলেশন যেটা ফাইবার অপটিক কে সুরক্ষিত করে। সবার বাইরে থাকে প্লাস্টিকের শক্ত জ্যাকেট।



ফাইবার অপটিক ক্যাবল বিভিন্ন আকারের হতে পারে। এটি নির্ভর করে এর কোর ফাইবার অপটিকের আকারের উপর। সচরাচর ব্যবহৃত ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কোর ফাইবারের সাইজ হয় ৬২.৫/১২৫ মাইক্রন। এখানে ৬২.৫ মাইক্রন হলো কোর ফাইবারের ডায়ামিটার, আর ১২৫ হলো ক্ল্যাডিঙের সাইজ। এ ধরনের ফাইবারকে বলা হয় মাল্টিমোড (multimode) ফাইবার অপটিক ক্যাবল। মাল্টিমোড ফাইবারে একই সাথে একাধিক আলোক সংকেত প্রেরণের পথ থাকে এবং এসব পথ দিয়ে সবকটি সিগন্যাল একইসাথে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। এর ফলে গ্রহীতার কাছে মনে হয় একটিমাত্র আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে পুরো ডাটা এসেছে। এটি লেড (light-emitting diode) ব্যবহার করতে পারে বলে মাল্টিমোড ফাইবার খরচ কম হয়। সিঙ্গলমোড (single-mode) ফাইবার ব্যবহার করা হয় দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য। সিঙ্গল মোড ফাইবারে একসাথে কেবল একটি আলোক সংকেত প্রেরণের পথ থাকে এবং সাধারণত লেজার সিগন্যালিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কোর ফাইবারের ডায়ামিটার হলো ৮/১২৫ মাইক্রন। কোনো রিপিটার ছাড়াই সিঙ্গল-মোড ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে ৩ মাইল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়।

আনগাইডেড মিডিয়া বা তারবিহীন বা বেতার মাধ্যম (Wireless Medium)

তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাকেই তারবিহীন মাধ্যম বলে। অর্থাৎ কোনো রকম ক্যাবল বা তার সংযোগ ছাড়াই ডেটা স্থানান্তর করার মাধ্যমকে তারবিহীন মিডিয়া বলে।

তারবিহীন মিডিয়া সাধারণত খুব তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ব্যান্ড ব্যবহার করে। এই ধরণের যোগাযোগকে প্রায়শই ওয়্যারলেস যোগাযোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই যোগাযোগ মিডিয়ার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানেও খুব সহজেই ডেটা স্থানান্তর করা যায়।

তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে তথ্যের আদান-প্রদান করা হয়। এই ক্ষেত্রে অ্যান্টেনা (Antenna) ডেটা আদান-প্রদানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিচের তিন ধরণের তরঙ্গ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা—

1. **বেতার তরঙ্গ (Radio Wave)**
2. **মাইক্রোওয়েভ (Microwave)**
3. **অবলোহিত আলোক রশ্মি (Infrared)**

মডুলেশনের মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করে ডেটা প্রেরণ করা হয়।

কোন পর্যাবৃত্ত তরঙ্গকে ব্যবহার করে একটি তথ্য সংকেত প্রেরণের জন্য উক্ত তথ্য সংকেতটিকে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে মড্যুলেশন (Modulation) বলে। অন্যভাবে, টেলিযোগাযোগ এবং সিগনাল প্রোসেসিং এ কোন তরঙ্গের তাৎক্ষণিক কম্পাঙ্কের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহক তরঙ্গের পরিবর্তনের মাধ্যমে তথ্য এনকোড করার প্রক্রিয়াকে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন (এফএম) বলে।

অপরদিকে যে পদ্ধতির মাধ্যমে মূল মডুলেটিং সিগন্যাল আলাদা করা হয়, তাকে ডিমডুলেশন (Demodulation) বলে। অর্থাৎ এটি অডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে হাই-ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা করে।

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট যোগাযোগ করা যায়।

পয়েন্ট টু পয়েন্ট পদ্ধতিতে সিগন্যাল একটি নির্দিষ্ট টার্গেটকে লক্ষ্য করে প্রক্ষেপন করা হয়। এতে শুধু ঐ নির্দিষ্ট টার্গেটটিই সিগন্যাল রিসিভ বা গ্রহণে সমর্থ হয়। এতে ওয়ার্ক স্টেশন বা সিগনাল রিসিভিং ডিভাইস কোনো ক্রমেই স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। আর পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট (পিএমপি) যোগাযোগ বলতে বোঝায় এমন যোগাযোগ যা এক থেকে একাধিক সংযোগের একটি স্বতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ একক অবস্থান থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পথ সরবরাহ করে।

পয়েন্ট টু পয়েন্ট কিংবা পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুই ধরণের অ্যান্টেনা ব্যবহৃত হয়।

- ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা
- রিসিভার অ্যান্টেনা

ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা তড়িৎ সিগন্যালকে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তর করে যা বায়ু, পানি ও মহাশূন্য দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। রিসিভার অ্যান্টেনা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গকে তড়িৎ সিগন্যালে রূপান্তর করে।

সিগন্যাল যেভাবে প্রেরণ বা গ্রহণ করে তার উপর ভিত্তি করে অ্যান্টেনা দুই ধরণের। যথা—

- দিকযুক্ত অ্যান্টেনা (Directional Antena)
- দিকবিহীন অ্যান্টেনা (Omni Directional Antena)

দিকযুক্ত ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা তরঙ্গকে টর্চলাইটের আলোর মত একদিকে প্রেরণ করে এবং রিসিভার অ্যান্টেনা ঐ তরঙ্গ গ্রহণের জন্য মুখোমুখি (Line of Sight) অবস্থানে থাকতে হয়।

অপরদিকে দিকবিহীন ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা তরঙ্গকে বাল্বের আলোর মত চারদিকে প্রেরণ করে এবং রিসিভার অ্যান্টেনা ঐ তরঙ্গ সবদিক থেকেই গ্রহণ করতে পারে।

রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গের সাহায্যে ডেটা ট্রান্সমিশন

3KHz হতে 300GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1mm থেকে 100km পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত বেতার যোগাযোগে ব্যবহৃত হয় বলে একে রেডিও ওয়েভ বলা হয়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি কম্পিউটার একই ফ্রিকুয়েন্সিতে সেট করা থাকে যাতে এগুলো অন্য কম্পিউটার থেকে সিগনাল গ্রহন করতে পারে। সাধারণত ডেটা কমিউনিকেশনে 10KHz থেকে 1GHz ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবহৃত হয়। রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশন দুই ধরণের। একটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত, অন্যটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রেডিও ওয়েভ সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না।

রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশনের প্রকারভেদ

রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশন তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—

1. লো-পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি বা ন্যারো ব্যান্ড ট্রান্সমিশন
2. হাই-পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি
3. স্প্রেড স্পেকট্রাম

লো-পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি বা ন্যারো ব্যান্ড ট্রান্সমিশন

এটি শুধু একটি ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে যা ৭০ মিটার বা ২৩০ ফুটের মধ্যে ট্রান্সমিশন উপযোগী। ট্রান্সমিশন গতি ১ থেকে ১০ Mbps।

হাই-পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি

অনেক বেশী দূরত্বে সিগনাল পাঠানো যায়। চলার পথে কোনো বাধা থাকলে তা ভেদ করতে সক্ষম। ট্রান্সমিশন গতি ১ থেকে ১০ Mbps।

স্প্রেড স্পেকট্রাম

সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিশনে কেবল একটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়, আর স্প্রেড স্পেকট্রাম রেডিও ট্রান্সমিশনে একাধিক ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়।

রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশনের সুবিধা

- রেডিও ওয়েভ বিল্ডিং বা দেয়াল ভেদ করতে পারে। সুতরাং এটি ইনডোর এবং আউটডোর উভয় যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার একই সরল রেখায় থাকার প্রয়োজন নেই।
- রেডিও ওয়েভ বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয় না, ফলে বায়ুমণ্ডল দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়।

রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

- রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশনে নিম্নসীমার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয়, বিপুল পরিমাণ তথ্য একসাথে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না।
- রেডিও ওয়েভ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশনের ব্যবহার

- রেডিও বা বেতার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।
- মোবাইল যোগাযোগের লিংক স্থাপনে।
- টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং।
- ইন্টারনেট সংযোগের জন্য টাওয়ার টু টাওয়ার রেডিও লিংক ব্যবহার করা হয়।
- যখন একজন প্রেরক এবং অনেকগুলো রিসিভার থাকে তখন মাল্টিকাস্টিংয়ের জন্য একটি রেডিও ওয়েভ দরকারী।
- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোওয়েভ এর সাহায্যে ডেটা ট্রান্সমিশন

300MHz হতে 300GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1mm থেকে 1m পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।

মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটি রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না তাই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার মুখোমুখি থাকতে হয়। মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং পথে কোনো বস্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

অধিক দূরত্বের যোগাযোগে মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয়। মাইক্রোওয়েভ মাধ্যম ব্যবহার করে ডেটা, ছবি, শব্দ স্থানান্তর করা সম্ভব।

মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য

- মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।
- মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটি রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
- মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা বড় কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের প্রকারভেদ

মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন দুই প্রকার। যথা—

1. টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
2. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন

এই ধরণের প্রযুক্তিতে ভূপৃষ্টেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার দৃষ্টি রেখায় যোগাযোগ করে। কোনো বাধা না থাকলে ১ থেকে ৫০ মাইল পযর্ন্ত ডেটা চলাচল করতে পারে।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন

এক্ষেত্রে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ভূ-পৃষ্ঠে থাকে স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা এবং মহাশূন্যে থাকে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা বা ট্রান্সমিটারগুলো স্যাটেলাইটকে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল প্রেরণ করে। স্যাটেলাইটে পাঠানোর পর এই সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। স্যাটেলাইটে অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার থাকে যা ক্ষীণ সংকেতকে অ্যামপ্লিফাই করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে পাঠায়।

স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ মহাকাশে থেকে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। সৌরশক্তি ব্যবহারের কারণে উপগ্রহ মহাকাশে রাখতে জ্বালানি বা শক্তি খরচ করতে হয় না। স্যাটেলাইটের মৌলিক উপাদানগুলো হল প্রাপক এন্টেনা, প্রেরক এন্টেনা ও ট্রান্সপন্ডার। পৃথিবীতে অবস্থিত স্টেশনগুলোতে শক্তিশালী এন্টেনা থাকে যার নাম VSAT (Very Small Aperture Terminal)।

VSAT এন্টেনাগুলো সবসময় স্যাটেলাইটের দিকে রাখতে হয়। স্যাটেলাইটগুলো অনেক দূরে অবস্থিত থাকার কারণে অধিক শক্তিতে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করতে হয়। মহাশূন্যে অবস্থিত স্যাটেলাইট ও ভু-পৃষ্ঠের ডিশ এন্টনার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৫০,০০০ কি.মি। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে সিগন্যালকে প্রথমে ৫০,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে ভূপৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইটে পৌঁছাতে হচ্ছে, তারপর আবার ৫০,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে ভূপৃষ্ঠে ফেরত আসতে হচ্ছে। এই দূরত্ব অতিক্রমের ফলে সিগন্যাল ট্রান্সমিশনে কিছু বিলম্ব ঘটে। এই বিলম্বকে প্রোপাগেশন ডিলে (propagation) বলা হয়।

মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের সুবিধা

- ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি তাই এটি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ তথ্য একসাথে ট্রান্সমিট করা যায়।
- কোন প্রকার ক্যাবল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- পাহাড়ি ও দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য এটি সুবিধাজনক।

মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

- মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।
- মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।

স্যাটেলাইটের ব্যবহার

- টেলিভিশন সিগন্যাল পাঠানোর কাজে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
- ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে।
- আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে।

ইনফ্রারেড বা অবলোহিত আলোক রশ্মির সাহায্যে ডেটা ট্রান্সমিশন

300GHz হতে 400THz ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় ইনফ্রারেড। এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 750nm থেকে 1mm পর্যন্ত হয়ে থাকে। খুবই নিকটবর্তী দুটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহারের সময় ইনফ্রারেড ব্যবহার করে থাকি। টেলিভিশন সেটের রিমোট কন্ট্রোলে এ ধরনের ট্রান্সমিশন ব্যবহার করা হলেও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জন্য এটি তেমন উপযোগী নয়। একসাথে একইদিকে কিংবা উভয় দিকে ইনফ্রারেড সিগন্যাল প্রেরণ ও গ্রহণ করা যেতে পারে। একমুখী ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে গতি হতে পারে 16 MBPS, আর উভয়মুখী ট্রান্সমিশনের জন্য গতি হবে 1 MBPS বা তারও কম। এ ধরনের ট্রান্সমিশন সিগন্যাল সর্বোচ্চ ৩০ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে এবং মাঝখানে কোনো বাধা থাকলে তা ভেদ করে যেতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে ছোট ধরনের ল্যানের জন্যই এটি উপযোগী হতে পারে। উজ্জ্বল আলো থাকলে ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশন বাধাগ্রস্ত হয়। ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশন দু'ধরনের হতে পারে যেমন পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং ব্রডকাস্ট।

পয়েন্ট টু পয়েন্ট ট্রান্সমিশনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে। আর ব্রডকাস্ট হচ্ছে একমুখী যোগাযোগ পদ্ধতি। ব্রডকাস্ট ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশনে এক জায়গা থেকে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হয় এবং বিভিন্ন ওয়ার্কস্টেশন সেই সিগন্যাল রিসিভ করতে পারে।

ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশনের সুবিধা

- দামে সস্তা।
- বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন কম।
- স্বল্প দূরত্বে (প্রায় ১০ মিটার) ভালো কাজ করে।

ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

- অধিক দূরুত্বে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
- ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের মধ্যে কোন প্রতিবন্দক থাকলে কাজ করে না।

ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশনের ব্যবহার

- রেডিও, টিভি, এসি ইত্যাদির রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে।
- কম্পিউটারের তারবিহীন কিবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজে।

তারবিহীন মাধ্যমের গুরুত্ব

- দূরবর্তী ও দূর্গম স্থানসমূহের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তারবিহীন মাধ্যম উপযোগী।
- বহনযোগ্য ডিভাইসের (মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ইত্যাদি) মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তারবিহীন মাধ্যম ব্যবহার বেশি উপযোগী।

সেলুলার নেটওয়ার্ক

সেলুলার নেটওয়ার্ক হচ্ছে এক ধরনের তারবিহীন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। স্থলভূমির একটি নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে বেতার তরঙ্গ প্রেরণে এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। এতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সিগন্যাল আদান-প্রদানে সক্ষম এমন ট্রান্সমিটার ডিভাইস (বেস স্টেশন) মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপিত হয়। এই ডিভাইসের প্রতিটি সেল ভিন্ন ধরনের তরঙ্গ বহন করে। যার প্রতিটি তরঙ্গের আলাদা সিগন্যাল থাকে। সেলুলার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় ট্রান্সমিটার ডিভাইস বহুদূর পর্যন্ত বেতার তরঙ্গ পৌছে দিতে পারে। এর ফলে বেসস্টেশন থেকে বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ডিভাইস নেটওয়ার্ক পায়। বর্তমানে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক ডিভাইসে তরঙ্গ পৌছে দিতে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

সেলুলার কমিউনিকেশন সিস্টেম (Cellular Communication System)

সেলুলার কমিউনিকেশন হচ্ছে এক ধরনের Duplex System, যেখানে একই সাথে sender এবং receiver একইসময় যোগাযোগ করতে পারেন।

মোবাইল ফোন হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যাকে Cellular Communication System এর মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। তাই মোবাইল ফোনকে সেলফোন বা হ্যান্ডসেট বলে। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা একে অপরের সাথে মোবাইলের মাধ্যমে একটা কিংবা অনেকগুলো Base Station-এর আন্ডারে যোগাযোগ করতে পারেন।

মোবাইল শব্দটি এসেছে “mobility” থেকে, যার অর্থ হচ্ছে সঞ্চারণশীল বা চলমান। অর্থাৎ এই ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা চলমান অবস্থায় থেকে যেকোনো জায়গা থেকে যোগাযোগ করতে পারেন।

মোবাইল ফোন গুলো যে Base station এর আন্ডারে থেকে কাজ করে সেই base station গুলো একটা Antenna এর মাধ্যমে প্রতিটা এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু জায়গাকে cover করে রাখে। এই জায়গা বা area গুলোর মধ্যে থাকা যেকোনো মোবাইল তখন base station কে ব্যবহার করে telecommunication ঘটাতে পারে। একটা মোবাইল ফোন এবং base station এর antenna এর মধ্যে radiowave সিগন্যাল কাজ করে। তাই যেকোনো বাঁধা থাকুক না কেন, ঘরের ভেতরে হোক কিংবা রুমের ভেতরে হোক, আমরা সহজেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অনেক দূরে থাকা মানুষদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কেননা রেডিও ওয়েভ যেকোনো বাঁধা অতিক্রম করতে পারে।

শুরুতে মোবাইল ফোনকে ডিজাইন করা হয়েছিল Voice communication system এর জন্য। কিন্তু এখনকার মোবাইল ফোনগুলোতে voice transmit করার পাশাপাশি মেসেজ আদান-প্রদান, ইমেইল পাঠানো, ইন্টারনেট চালানো, বিভিন্ন ধরনের গেম খেলা কিংবা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা ইত্যাদি সব কাজই করা যায়।

Cellular Communication System যেভাবে কাজ করে

একটা স্থির এবং একটা চলনশীল বস্তুর মধ্যে Cellular Communication তৈরি করা হয়। যে বস্তুটি চলনশীল সেটি হচ্ছে আমাদের ব্যবহার করা মোবাইল ফোন, আর যেটি স্থির থাকে সেটি হচ্ছে Base station। অর্থাৎ একটা Cellular Communication System মোট দুটো অংশ নিয়ে গঠিত—

1. Statable Object (Base Station)
2. Moving Object (Mobile Phone Device)

Base station আবার দুটো ভাগ নিয়ে তৈরি—

1. Base station Office
2. Antenna

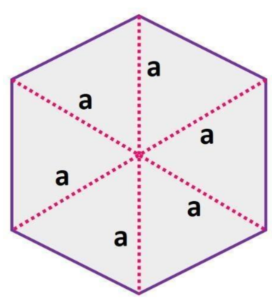
একটা base station এর চারপাশে যে জায়গা বা area জুড়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের coverage থাকে তাকে Cell বলে। অর্থাৎ প্রতিটা Cell গঠিত হয় একটা Antenna এবং Base station office দিয়ে। তাই cell নিয়ে তৈরি হওয়া এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে Cellular Communication বলা হয়। Base station-এ থাকা Antenna রেডিও ওয়েভ সিগন্যালকে transmit বা receive করতে পারে এবং base station office পুরো base station এর কার্যকলাপকে পরিচালনা করে।



Cellular communication system এর প্রতিটা cell এর একটা নির্দিষ্ট frequency থাকে। এই frequency ব্যবহার করে Base station এর Antenna কাজ করে। একইসাথে এই antenna কোনো মোবাইলের data connection কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই একটা Base station যেকোনো ফোনের data signal কে transmit, receive এবং control করতে পারে।

Cellular communication system এর প্রতিটা cell এর আকৃতি (Shape) বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন- বৃত্তাকার (Circular), বর্গাকার (Square), ত্রিভুজাকার (Triangular), পঞ্চভুজ (Pentagon) ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত Cell এর shape হচ্ছে ষড়ভুজাকার বা Hexagon shape। এর কয়েকটা কারণ হচ্ছে—

- Hexagon আকৃতির cell এর coverage area সবচেয়ে বেশি থাকে।
- Hexagon cell এর ঠিক মাঝে Antenna স্থাপন করলে সেই cell-এর প্রতিটা শীর্ষবিন্দু থেকে Antenna-এর দূরত্ব সমান থাকে।
- পাশাপাশি অনেকগুলো hexagon cell এর মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না। তাই একটা দেশে যদি অনেকগুলো hexagon আকৃতির cell গঠন করা হয় তবে তাদের মাঝে কোন ফাঁকা স্থান থাকবে না বলে খুব সহজেই continuously মোবাইল কমিউনিকেশন করা যাবে।



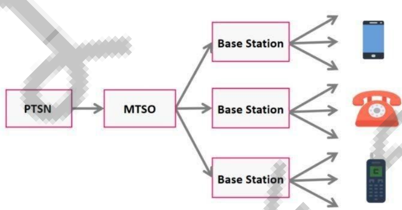
Hexagonal Cell

প্রতিটা Hexagon cell এর diameter সাধারণত 10 থেকে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের Cell কে সাধারণত Macro Cell বলে, যেটি বড় কোনো এলাকায় cellular network এর coverage দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

আবার ঘনবসতি পূর্ণ এলাকাতে যখন মোবাইল ব্যবহারকারীর পরিমাণ বেশি থাকে তখন প্রতিটা cell কে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র cell এ ভাগ করা হয়, যাদেরকে Micro Cell বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটা cell এর diameter হয় 1 km পর্যন্ত।

এছাড়া এমন অনেক অতি ক্ষুদ্র জায়গা আছে যেমন কোনো বিল্ডিং বা টানেলের মধ্যে Cellular network তৈরি করার জন্য খুব ছোট সাইজের cell ব্যবহার করা হয়, যাকে Pico Cell বলে। এই ধরনের cell গুলোর জন্য base station এর power level অনেক কম থাকে এবং Antenna গুলো খুব অল্প পরিমাণ জায়গা coverage দিতে পারে।

যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করি তখন আমাদের ফোনের মাধ্যমে সেই নাম্বারের সিগন্যাল base station এর Antenna তে গিয়ে received হয়। Antenna তখন একটা নির্দিষ্ট radiowave frequency এর মাধ্যমে সেই নাম্বারের user কে খোঁজার জন্য তার cell এর coverage area তে signal transmit করে। যদি আমাদের কাঙ্খিত user সেই base station এ না থাকে তবে base station অভ্যন্তরীণভাবে সেই নাম্বারকে মোবাইল অপারেটরের অফিসে পাঠিয়ে দেয় যাকে MTSO বা Mobile Telecommunication Switching Office বলে। একটা নির্দিষ্ট মোবাইল অপারেটরের MTSO এর সাথে পুরো দেশের সেই অপারেটরের প্রত্যেকটা Base station সংযুক্ত থাকে। কাজেই MTSO তখন পুরো দেশের প্রতিটা base station এ নাম্বারটা কে ছড়িয়ে দেয়। ফলে দেশের যেকোনো প্রান্তে যদি এই নাম্বারের ব্যবহারকারী থাকেন তবে তার সাথে আমারা মোবাইলে যোগাযোগ করতে পারি। আমাদের দেশে রবি কিংবা গ্রামীণফোন, এসব মোবাইল অপারেটরের প্রতেকের জন্য MTSO রয়েছে। মূলত MTSO হচ্ছে একটা মোবাইল অপারেটরের হেডকোয়ার্টার। এতে প্রতিটা ব্যবহারকারীর ফোন নম্বর এবং তাদের ডেটাবেজ, সেইসাথে তাদের Location track করার মত ক্ষমতা থাকে। একটা দেশে বিভিন্ন MTSO-কে নিয়ন্ত্রণ করে সেই দেশের সরকারের একটা বিশেষ সংস্থা যাকে PSTN (Public Switched Telephone Network) বলা হয়। তাই একটা সম্পূর্ণ Celular Communication System গঠিত হয় PSTN, MTSO এবং Base Station নিয়ে। নিচে একটা Cellular Communication System এর ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো-



Cellular Communication System Block Diagram

Base station এ থাকা একটা Antenna শুধুমাত্র একটা hexagon cell এর area কে coverage করতে পারে। তাই আমাদের দেশের যেকোনো একটা জায়গা যেমন উত্তরাতে যদি কোনো মোবাইল কোম্পানি এর base station থাকে, তবে সেই base station এর Antenna শুধুমাত্র উত্তরাতে থাকা মোবাইল ফোন গুলোকে তার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করতে পারবে। কিন্তু সেই Antenna পাশের এলাকা যেমন বনানী এর কোনো মোবাইলকে তার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করতে পারবে না।

প্রতিটা base station এর antenna থেকে দুই-তিন সেকেন্ড পরপর একটা Radiowave তৈরি করে যা সম্পূর্ণ cell এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এই cell-এর আন্ডারে থাকা সকল মোবাইল অটোমেটিক ভাবে antenna এর সাথে connected হয়ে যায়। তাই মোবাইল চালু করার পর আমরা প্রায়ই দেখি প্রথম কয়েক সেকেন্ড মোবাইলে নেটওয়ার্ক থাকে না, কিন্তু তার পরেই মোবাইলে নেটওয়ার্ক বা data connection চলে আসে।

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক (interconnected network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। পরস্পর সংযুক্ত অনেকগুলি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কার্যক্রমের সমন্বয়ই হলো ইন্টারনেট। আর নেটওয়ার্ক হলো এমন সিস্টেম যেখানে সবাই মিলে তথ্য শেয়ার করা যায় বা কাজ করা যায়।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এজন্য বিশ্বে ব্যবহৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

1. মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ
2. ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ
3. সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ

মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ

মালিকানা অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দুই ধরণের। যথা—

1. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক
2. পাবলিক নেটওয়ার্ক

প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সাধারণত কোনো প্রতিষ্টান বা ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়। অন্য কেউ চাইলে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। এই ধরণের নেটওয়ার্কে সিকিউরিটি এবং ডাটা ট্রান্সমিশন গতি অনেক ভালো হয়। অপরদিকে পাবলিক নেটওয়ার্ক সাধারণত কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন হয় না। তবে এটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্য যে কেউ চাইলে নির্দিষ্ট পরিমান ফি প্রদান করে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। যেমন টেলিফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম।

ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ

ভৌগলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সমূহকে সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

1. LAN (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক)
2. MAN (মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক)
3. WAN (ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক)
4. PAN (ব্যক্তিগত এরিয়া নেটওয়ার্ক)
5. HAN (হোম এরিয়া নেটওয়ার্ক)
6. CAN (ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক)

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network)

একই বিল্ডিং এর মাঝে কয়েকটি কম্পিউটার নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্ককে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। একে সংক্ষেপে ল্যান (LAN) বলা হয়।

মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network)

একই শহরের মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি ল্যানের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টারফেসকে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। একে সংক্ষেপে ম্যান (MAN) বলা হয়।

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network)

দূরবর্তী ল্যানসমূকে নিয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ককে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। সাধারণত দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। একে সংক্ষেপে ওয়্যান (WAN) বলা হয়।

ব্যক্তিগত এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network)

যখন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে, ব্যক্তিগত ভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকে তাকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। একে সংক্ষেপে প্যান (PAN) বলা হয়। এই ধরনের নেটওয়ার্ক মূলত দুটি মোবাইলের মধ্যে কানেক্ট করা হয়। এছাড়াও PAN এর মধ্যে একটি বা একাধিক কম্পিউটার পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে থাকতে পারে। এর বাইরেও এই নেটওয়ার্ক এর মধ্যে Telephone, Video Game Console ইত্যাদি সংযুক্ত থাকতে পারে।

হোম এরিয়া নেটওয়ার্ক (Home Area Network)

এই ধরনের নেটওয়ার্ক ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এই ধরনের নেটওয়ার্ক, শুধুমাত্র পার্সোনাল বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যখন একটি পুরো পরিবার তার নিজস্ব ঘরের মধ্যে থেকে কোন নেটওয়ার্ক তৈরি করে তখন তাকে হোম এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। একে সংক্ষেপে হ্যান (HAN) বলা হয়।

ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (Campus Area Network)

নির্দিষ্ট কোনো ক্যাম্পাস বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম করবার জন্য যে ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় সেটাকে ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। একে সংক্ষেপে ক্যান (CAN) বলা হয়। এই ধরনের নেটওয়ার্ক কোন প্রতিষ্ঠান বা ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং এই ধরনের নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ক্যাম্পাসের ছাত্র এবং শিক্ষকরা ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই ধরনের নেটওয়ার্ক, Local Area Network এরই অন্তর্গত।

সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ

সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সমূহকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়।

1. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক
2. পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক
3. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক

কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটা স্টোর, নিরাপত্তা দেয়া, বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক খুবই উপযোগী। এই নেটওয়ার্ক সিস্টেমে একটি কম্পিউটারে সকল রিসোর্স থাকে। এবং অন্যান্য কম্পিউটারগুলো এসব রিসোর্স ব্যবহার করে। যে কম্পিউটার রিসোর্স শেয়ার করে সেটিকে সার্ভার বলে। আর যেসব কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করে তাদেরকে ক্লায়েন্ট বলে। অপরদিকে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক সিস্টেমে প্রত্যেক কম্পিউটার হতে রিসোর্স শেয়ার করা যায়। এ সিস্টেমে প্রতিটি কম্পিউটার একই সাথে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট। এরা প্রত্যেকেই রিসোর্স শেয়ারের ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা পালন করে। আর হাইব্রিড নেটওয়ার্ক সিস্টেম মূলত ক্লায়েন্ট সার্ভার এবং পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণত হাইব্রিড নেটওয়ার্কে সার্ভার অংশের প্রাধান্য থাকে। তবে এর পাশাপাশি অল্প বিস্তারে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের অংশ থাকে।

ইথারনেট

ইথারনেট হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে অনেকগুলো কম্পিউটারকে ক্যাবল বা তারের মাধ্যমে যুক্ত করে ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ম্যান বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থাকে ইথারনেট বলে।

ইথারনেটের প্রকারভেদ

ইথারনেটকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

1. বেসবান্ড ইথারনেট
2. ব্রডব্যান্ড ইথারনেট।

বেসবান্ড ইথারনেট কে আবার পাঁচ ভাগ করা হয়। যথা—

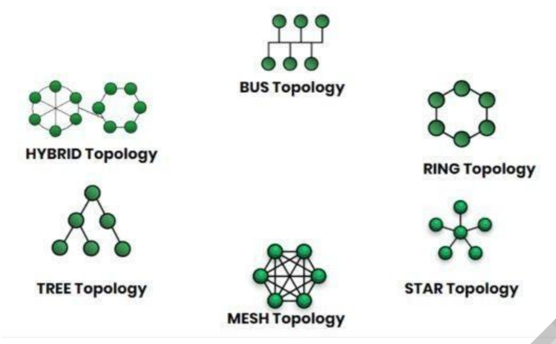
1. 10 Base 5
2. 10 Base 2
3. 10 Base T
4. 100 Base T
5. 10 Base F

প্রত্যেকটিতে 10 বা 100 হল তথ্য পাঠানোর হার। যেমন 10 Mbps, 100 Mbps ইত্যাদি। Base হল বেসবান্ড ট্রান্সমিশন। 5, 2 এবং T এগুলি ক্যাবল এর ধরন ও দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে।

আর ব্রডব্যান্ড ইথারনেট হলো 10 Broadband 36। এক্ষেত্রে তথ্য পাঠানোর হার হল 10 Mbps। Broadband হলো ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন। 36 হল ক্যাবল এর দৈর্ঘ্য।

নেটওয়ার্ক টপোলজি

যে ব্যবস্থায় কম্পিউটার সমূহ বা নোড সমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলে।



নেটওয়ার্ক টপোলজির প্রকারভেদ

নেটওয়ার্ক টপোলজি ছয় প্রকার। যথা—

1. বাস টপোলজি
2. রিং টপোলজি
3. স্টার টপোলজির
4. ট্রি টপোলজির
5. মেস টপোলজি
6. হাইব্রিড টপোলজি

ওয়াইফাই

Wi-Fi শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো Wireless Fidelity (ওয়ারলেস ফিডেলিটি)। কম্পিউটার বা ডিজিটাল বৈদ্যুতিক ডিভাইস গুলোকে তারবিহীন উপায়ে ইন্টারনেট সংযুক্ত করার প্রযুক্তিকে ওয়াইফাই বলে। ওয়াইফাই একটি ওয়ারলেস বা তারবিহীন প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে একে অপরের সাথে তথ্য সরবরাহ করতে তারের পরিবর্তে একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত ব্যবহার করে। ওয়াইফাই সমর্থিত ডিভাইস গুলো যেমন মোবাইল ল্যাপটপ ডিজিটাল অডিও প্লেয়ার প্রভৃতি একটি ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট এর সাথে যুক্ত হতে পারে। ইন্টারনেট এক্সেস এর জন্য ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক যুক্ত এলাকাকে হটস্পট বলে। ওয়াইফাই এর মাধ্যমে বাসায় ইন্টারনেট এক্সেস এর জন্য যে রাউটার ব্যবহার করা হয় সেটি মূলত হটস্পট প্রদান করে। এছাড়া কেউ যদি তার মোবাইল থেকে অন্য কাউকে নেটওয়ার্ক শেয়ার করতে চায় তবে সেখানে হটস্পট চালু করতে হয়।

ওয়াইম্যাক্স

ওয়াইম্যাক্স হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড ইন্টারঅপারেবিলিটি ফর মাইক্রোওয়েভ এক্সেস' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অপর নাম ওয়ারল্যাসম্যান। এটি একটি বিশেষ পদ্ধতির টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি। যার মাধ্যমে পয়েন্ট টু পয়েন্ট থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মোবাইল সেলুলার ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের তারবিহীন যন্ত্রে তথ্য আদান প্রদান করা যায়।

ওয়াইম্যাক্স এবং ওয়াইফাই একই পর্যায়ের প্রযুক্তি। তবে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। ওয়াইফাইয়ের কাভারেজ ৩০ থেকে ১০০ মিটার। আর ওয়াইম্যাক্সের কাভারেজ প্রায় ৫০ কিলোমিটার। ওয়াইফাইয়ের চেয়ে ওয়াইম্যাক্স বেশি ইউজার একসাথে ব্যবহার করতে পারে। ওয়াইফাই এর রেঞ্জ সর্বোচ্চ ৩০০ ফুট ব্যাসার্ধ। ম্যাক্সিমাম স্পীড ৫৪ MBPS। অপরদিকে ওয়াইম্যাক্স এর রেঞ্জ সর্বোচ্চ ৩০ মাইল ব্যাসার্ধ। ডাটা ট্রান্সফার রেট ম্যাক্সিমাম ৭০ MBPS।

ব্লুটুথ

ব্লুটুথ ক্ষুদ্র পাল্লার জন্য প্রণীত একটি ওয়্যারলেস প্রোটোকল। এটি ১০ থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে ওয়্যারলেস যোগাযোগের একটি পদ্ধতি। ব্লুটুথ-এর কার্যকরী পাল্লা হচ্ছে ১০ মিটার। তবে বিদ্যুৎ কোষের শক্তি বৃদ্ধি করে এর পাল্লা ১০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ব্লুটুথ তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের ২.৪৫ গিগাহার্টজ কম্পাঙ্কের ব্যান্ড ব্যবহার করে। এটি PAN (Personal Area Network) এর ওয়্যারলেস ভিত্তিক নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। এর মাধ্যমে স্বল্প দূরত্বের দুই বা ততোধিক মোবাইল এবং ফিক্সড ডিভাইসের মধ্যে একই সাথে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।

রাউটিং ও রাউটার

এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে রাউটিং বলে। আর এ রাউটিং এর জন্য যে হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাই হলো রাউটার।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরান্স বা EMI

কোনো ইলেকট্রিক সিগন্যালের আশেপাশে অন্য কোনো সিগন্যাল থাকলে একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করে। একে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরান্স বা EMI বলা হয়।

ব্যান্ডউইথ

একটি মাধ্যমে কী পরিমাণ ডাটা একক সময়ে পরিবাহিত হতে পারে তাকে বলা হয় ব্যান্ডউইডথ। যদি কোনো ক্যাবলে সেকেন্ডে ১০ MB ডাটা পরিবাহিত হতে পারে তাহলে তার ব্যান্ডউইডথ হলো 10 MBS^{-1} বা 10 MBPS।

এটিনুয়েশন

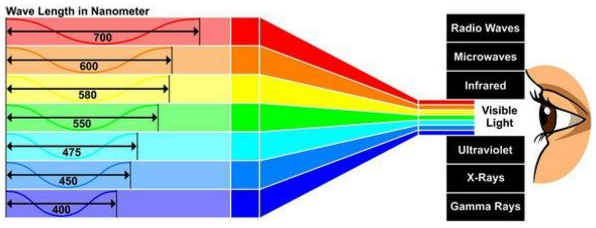
কোনো মিডিয়ার মধ্য দিয়ে সিগন্যাল কিছুদূর গিয়ে সাধারণত দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে বেশিদূর গেলে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দূরত্ব অতিক্রমের সাথে সাথে সিগন্যাল দূর্বল হয়ে যাওয়ার এই স্বভাবকে এটেনুয়েশন (attenuation) বলে।

ইভসড্রপিং

দুটি পয়েন্টের মধ্যে ডাটা ট্রান্সমিশন বাধাগ্রস্থ হওয়ার ঘটনাকে ইভসড্রপিং বলে।

দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ

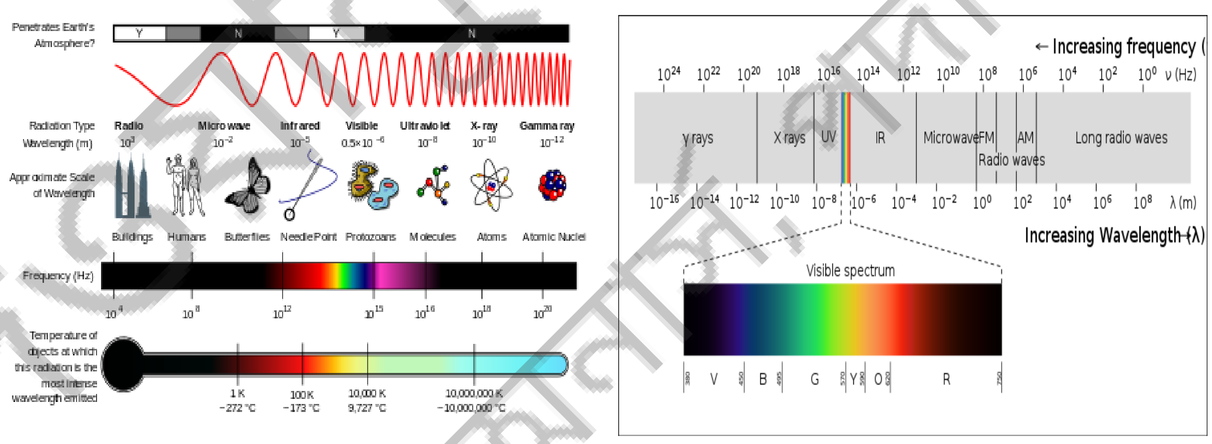
দৃশ্যমান আলো



যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ৪০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে দৃশ্যমান আলো বলা হয়।

আলো বা দৃশ্যমান আলো এক ধরনের বাহ্যিক কারণ, যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু এটি নিজে অদৃশ্য।

শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেমন নির্দিষ্ট সীমার কম-বেশি হলে আমরা শুনতে পাই না, তেমনি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে না হলে আমাদের দর্শনাভুতির সৃষ্টি হয় না। আমরা আলোকে দেখতে পাই না, কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি। মাধ্যমভেদে আলোর বেগের পরিবর্তন হয়ে থাকে। আলোর বেগ মাধ্যমের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক। শুন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সবচেয়ে বেশি, আলোর বেগ অসীম নয়। শূন্যস্থানে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২৯,৯৭,৯২,৪৫৪ মিটার বা ১,৮৬,০০০ মাইল। হিসাবের সুবিধার্তে শূন্যস্থানে আলোর বেগ, $C = 3\times10^8$ ms^{-1} ধরা হয়। আইনস্টাইন এর থিওরি অফ রিলেটিভিটি হতে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্বে আলোর বেগই সর্বোচ্চ বেগ অর্থাৎ কোনো কিছুর বেগই আলোর বেগকে অতিক্রম করতে পারবে না।



তড়িচ্চুম্বকীয় বর্ণালিতে দৃশ্যমান আলোর অবস্থান

আলো এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি। যা তির্যক তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করে। তাড়িৎ চৌম্বক বর্ণালীর ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক অনুসারে বর্ণালীর অবলোহিত তরঙ্গের পর আসে দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ।

সূর্যের বিকিরণের সর্বোচ্চ শক্তি হয় দৃশ্যমান আলোক বর্ণালি। যদিও সমগ্র বিকিরণ বর্ণালির শক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সূর্য দৃশ্যমান আলোক অপেক্ষা অবলোহিত তরঙ্গ সামান্য বেশি পরিমানে বিকীর্ণ করে। সমগ্র তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর মধ্যে দৃশ্যমান আলোকে মানুষের চোখ সবচেয়ে সংবেদনশীল। সাধারণত অণু বা পরমাণুর ইলেক্ট্রন এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে যাওয়ার সময় দৃশ্যমান আলো (এবং সন্নিকট অবলোহিত তরঙ্গ) বিশোষণ বা বিকিরণ করে। মানুষের দৃষ্টি এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের সময় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে তার পিছনে এই প্রক্রিয়া কাজ করে। সমগ্র তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর মধ্যে একটি খুব ছোট্ট অংশ হল দৃশ্যমান আলোক যা মানুষের দর্শনে সাহায্য করে।

আলোক বর্ষ

আলোক রশ্মি কোনো মাধ্যমে এক বছরে যে দুরত্ব অতিক্রম করে তাকে ওই মাধ্যমের আলোক বর্ষ বলে।

আলোকীয় পথ

কোনো মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে আলোকের যে সময় লাগে ঠিক সেই সময়ে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমের মধ্যদিয়ে আলোক যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে পারে, সে পথকে আলোকীয় পথ বলে।

আলোকিয় ঘটনা

আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মকে আলোকিয় ঘটনা বলে। যেমন প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সমবর্তন, অপবর্তন, ব্যাতিচার, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি।

আলোর প্রতিফলন

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশকালে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত হয়ে যদি পূর্বের মাধ্যমেই ফিরে আসে তবে তাকে আলোর প্রতিফলন বলে। আলোর প্রতিফলন, প্রতিফলকের প্রকৃতি ও মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আপতিত রশ্মি যত তির্যকভাবে প্রতিফলক তলের ওপর পড়বে, আলোর প্রতিফলন তত বেশি হবে।

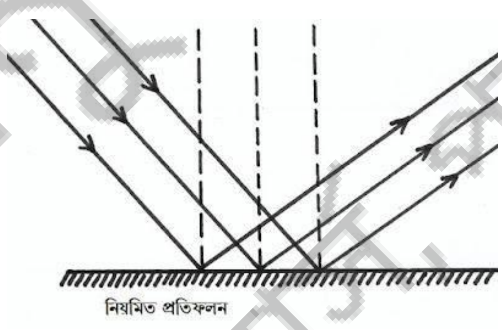
প্রতিফলনের প্রকারভেদ

আলোর প্রতিফলন দুই ধরণের। যথা—

1. নিয়মিত বা সুষম প্রতিফলন
2. অনিয়মিত বা ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

নিয়মিত প্রতিফলন

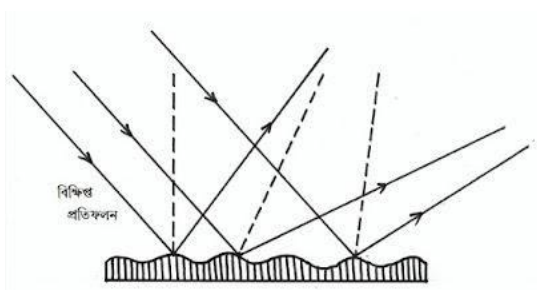
যখন একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোন পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল থাকে বা অভিসারী কিংবা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয়, তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে নিয়মিত বা সুষম প্রতিফলন বলে।



প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি আলোক রশ্মির আপতন কোণ সমান হয় ও প্রতিফলন কোণগুলোও সমান হয়।

অনিয়মিত প্রতিফলন

যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোন পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ অসমান্তরাল হয় অর্থাৎ অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত না হয় তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে অনিয়মিত বা ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে।



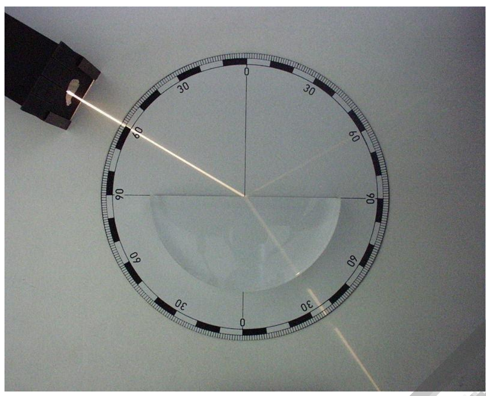
প্রতিফলক পৃষ্ঠ সমান্তরাল না হলে এরূপ হয়। এক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্মিগুলো প্রতিফলক পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন কোণে আপতিত হয় বলে তাদের প্রতিফলন কোণও বিভিন্ন হয়।

প্রতিফলক বা আলোক পৃষ্ঠ

যে পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয় তাকে প্রতিফলক বা আলোক পৃষ্ঠ বলে।

আলোর প্রতিসরণ

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশকালে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত হয়ে যদি বিভেদতল ভেদ করে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং আলোর দিক পরিবর্তিত হয় তবে তাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।



আলোর প্রতিসরণ

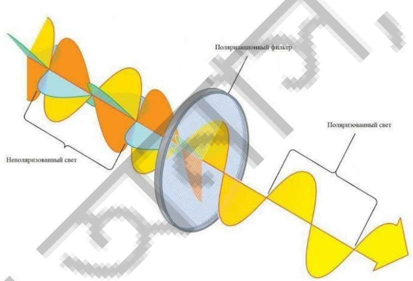
আলোর বিচ্যুতি

আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় দিকের পরিবর্তন করে। আলোর এই দিকের পরিবর্তনকেই আলোর বিচ্যুতি বলা হয়।

সমবর্তন বা পোলারায়ন

আলো যখন কোন জায়গা দিয়ে যায় তখন সে চারদিকে ছড়িয়ে পরে। এ আলোকে যদি একমুখী করা যায় তবে একে সমবর্তিত আলো এবং প্রক্রিয়াটিকে সমবর্তন বলে।

যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তলে কম্পমান আলোক তরঙ্গকে একটি নির্দিষ্ট তল বরাবর কম্পনমান করা যায় তাকে আলোর সমবর্তন বলে। অর্থ্যাৎ, বিশেষ দিকে আলোক তরঙ্গের বিসদৃশ কম্পনের ঘটনাকে সমবর্তন বা পোলারায়ন বলে।



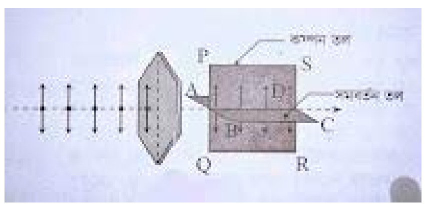
আলোর সমবর্তন

সমবর্তক বা আলোক পোলারাইজার

সমবর্তন ঘটানোর জন্য এমন কোনো পদার্থের প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করলে, তা আলোকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট তল বরাবর স্পন্দনশীল তরঙ্গ হিসেবে নির্গত করে। এই পদার্থ বা যন্ত্রগুলোকে সমবর্তক বা আলোক পোলারাইজার বলে।

সমবর্তন তল

আলোক তরঙ্গের কণাসমূহ যে সমতলে কম্পিত হয় সেই কম্পন তলের সাথে যে তলটি লম্বভাবে অবস্থান করে তাকে সমবর্তন তল বলে।

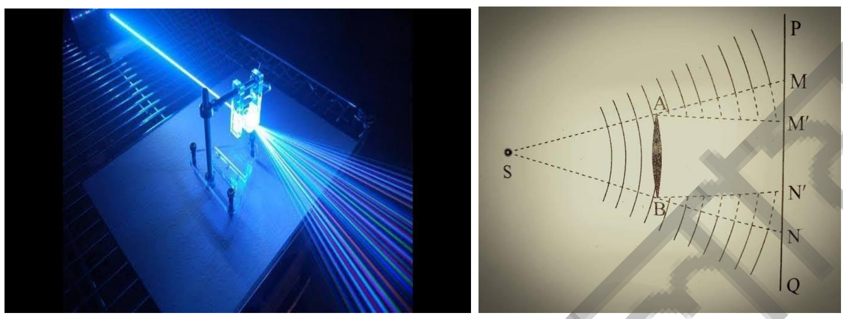


সমবর্তন তল

অপবর্তন

অপবর্তন হলো তীক্ষ্ণ বস্তুর পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় আলোর গতি বেঁকে যাওয়া।

কোনো প্রতিবন্ধকের ধার ঘেঁষে বা সরু চিরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলের মধ্যে আলো বেঁকে যাওয়ার ঘটনাকে আলোর অপবর্তন বলে।



আলোর অপবর্তন

অপবর্তন এমন একটি আলোকীয় ঘটনা, যেখানে কোনো প্রতিবন্ধকের ধার ঘেঁষে বা সরু চিরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলের মধ্যে আলো বেঁকে যায়। একই তরঙ্গমুখের বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত গৌণ তরঙ্গসমূহের উপরিপাতনের ফলে অপবর্তনের সৃষ্টি হয়। এছাড়া এই বেকে যাওয়ার পরিমাণ একেক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য একেক রকম। সাদা আলোকে এই ধরনের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অপবর্তিত করা হলে এর মধ্যে উপস্থিত সাতটি আলো ভিন্ন ভিন্ন কোণে বেকে যায়। এতে বর্নালীর সৃষ্টি হয়। একক চিরের দরুন অপবর্তনে পর্দায় মধ্যবিন্দু উজ্জ্বলতম হয়।

অপবর্তনের প্রকারভেদ

অপবর্তন দুই ধরণের। যথা—

1. ফ্রেনেল শ্রেণীর অপবর্তন
2. ফ্রনহোফার শ্রেণীর অপবর্তন

ফ্রেনেল শ্রেণীর অপবর্তন

উৎস ও প্রতিবন্ধকের দূরত্ব যদি সসীম হলে যে অপবর্তন হয়, তা ফ্রেনেল শ্রেণীর অপবর্তন।

ফ্রনহোফার শ্রেণীর অপবর্তন

উৎস ও প্রতিবন্ধকের দূরত্ব অসীম হলে যে অপবর্তন হয়, তা ফ্রনহোফার শ্রেণীর অপবর্তন।

তরঙ্গমুখ

কোনো তরঙ্গের ওপর অবস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলোর গতি পথকে তরঙ্গমুখ বলে।

অর্থ্যাৎ, কোনো উৎস থেকে তরঙ্গ যখন শূন্য বা কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয় তখন ওই মাধ্যমের বিন্দুগুলো কম্পিত হতে থাকে। যেকোনো মুহূর্তে একই দশা সম্পন্ন বিন্দুগুলো যে রেখায় বা তলের উপর অবস্থিত থাকে তাকে তরঙ্গমুখ বলে।

তরঙ্গমুখের প্রকারভেদ

তরঙ্গমুখ সাধারণত তিন প্রকারের হয়।

1. গোলীয় তরঙ্গমুখ
2. চোঙাকৃতি তরঙ্গমুখ
3. সমতল তরঙ্গমুখ

গোলীয় তরঙ্গমুখ

কোনো বিন্দু উৎস বা ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে আলোক তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে যে তরঙ্গমুখ অগ্রসর হয় সেটি গোলাকার তরঙ্গমুখ।

চোঙাকৃতি তরঙ্গমুখ

কোনো রেখা থেকে বা চিড় থেকে আলোক তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে যে তরঙ্গমুখ অগ্রসর হয় সেটি চোঙাকৃতি তরঙ্গমুখ। কারণ কোনো রেখা উৎস থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত বিন্দুগুলো একটি চোঙের তলে অবস্থান করে।

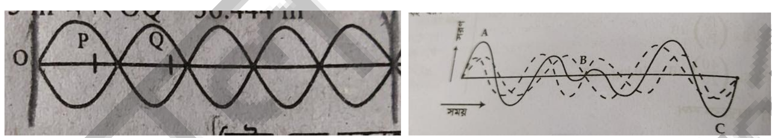
সমতল তরঙ্গমুখ

অসীমে অবস্থিত উৎস থেকে যে রশ্মিগুলো আসে সেগুলো সমান্তরাল হওয়ায় এর তরঙ্গমুখ সমতল হয়। ফলে সমতল তরঙ্গমুখ সৃষ্টি হয়।

তরঙ্গমুখ সাধারণত সময়ের সাথে সাথে চলমান প্রকৃতির। একমাত্রিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান কোন তরঙ্গের তরঙ্গমুখ সাধারণত কতগুলো একক বিন্দু; দ্বিমাত্রিক মাধ্যমে এগুলো কতগুলো বক্ররেখা, এবং ত্রিমাত্রিক মাধ্যমে তা কতগুলো পৃষ্ঠতল।

উপরিপাতন

ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দুটি তরঙ্গ একটির উপর দিয়ে আরেকটি চলার সময় স্থানে স্থানে তরঙ্গ দুটি একে অপরকে ছেদ করে এবং মিশে একই দশায় চলার প্রবণতা দেখায় একে উপরিপাতন বলে। উপরিপাতন সুষম কিংবা বিষম হতে পারে।



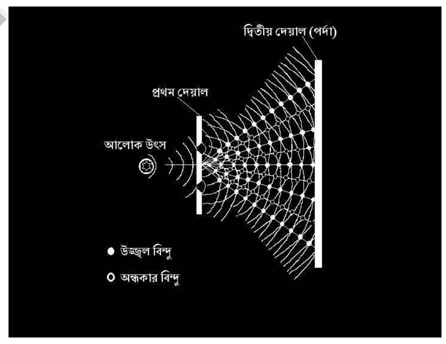
তরঙ্গের উপরিপাতন

ব্যতিচার

ব্যতিচার বলতে দুটি তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে সৃষ্ট নতুন তরঙ্গের বিস্তারের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনাকে বোঝানো হয়।

আলোর ব্যতিচার হল একই ধরণের কিংবা কাছাকাছি উৎস থেকে উৎপন্ন দুটি আলোক রশ্মির একটা আরেকটার উপর পড়ে নতুন রশ্মি তৈরি করার পর উক্ত রশ্মির হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার ঘটনা।

অর্থাৎ, দুটি সুসঙ্গত উৎস থেকে নিঃসৃত দুটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দুর আলোক তীব্রতা বৃদ্ধি পায় আবার কোনো বিন্দুর তীব্রতা হ্রাস পায়। এর ফলে কোনো তলে পর্যায়ক্রমে আলোকোজ্জ্বল ও অন্ধকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। কোনো স্থানে বিন্দু থেকে বিন্দুতে আলোর তীব্রতার এই পর্যায়ক্রমিক তারতম্যকে আলোর ব্যতিচার বলে।



আলোর ব্যতিচার

ব্যতিচারের প্রকারভেদ

ব্যতিচার দুই ধরনের হতে পারে। যথা—

1. গঠনমূলক ব্যতিচার (চরম বা উজ্জ্বল ডোরা)

2. ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (অবম বা অন্ধকার ডোরা)

গঠনমূলক ব্যতিচার

দুটি উৎস থেকে নিঃসৃত প্রায় সমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও সমান বিস্তার বিশিষ্ট দুটি আলোকতরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে সমদশায় মিলিত হলে কোনো বিন্দুর আলোক তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়, এই ঘটনাকে গঠনমূলক ব্যতিচার বলে।

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার

দুটি উৎস থেকে নিঃসৃত প্রায় সমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও সমান বিস্তার বিশিষ্ট দুটি আলোকতরঙ্গ উপরিপাতনের ফলে বিপরীত দশায় মিলিত হলে কোন বিন্দুর আলোক তীব্রতা হ্রাস পায় ও অন্ধকার হয়ে যায়। এই ঘটনাকে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বলে।

ঋজুগতি

আলোর ঋজুগতি বলতে, আলো সরলরেখা বরাবর চলে সেটা বোঝানো হয়। আলো সরলরেখায় চলার জন্যই সূর্যগ্রহন, চন্দ্রগ্রহন কিংবা কোনো বস্তুর ছায়া উৎপন্ন হয়।



আলোর ঋজুগতি

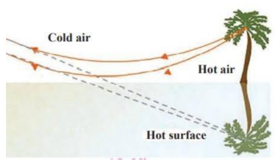
আলোক তড়িৎ ক্রিয়া

আলোক রশ্মি যখন কোনো ধাতবপৃষ্ঠে আপতিত হয় তখন ধাতবপৃষ্ঠের ইলেকট্রন আলোক রশ্মি থেকে শক্তি গ্রহণ করে। যখনই ইলেকট্রন দ্বারা গৃহীত শক্তি ধাতবপৃষ্ঠে তার বন্ধন শক্তির চেয়ে বেশি হয়, তখনই ইলেকট্রন ধাতবপৃষ্ঠ থেকে মুক্ত হয় বা বেরিয়ে আসে। এ ঘটনাকে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়া বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলা হয়।

অর্থ্যাৎ, কোনো কোনো ধাতুর উপর আলো পড়লে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার ঘটনাকে ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলে।

মরিচীকা

মরিচীকা হল একটি আলোকিয় ঘটনা। আলো ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় যদি ক্রান্তীয় কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয় তবে তা প্রতিফলিত হয় এবং পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে। মরিচীকায় এ ঘটনা ঘটে। মরুভূমিতে এ ঘটনা ঘটে কারণ সেখানকার নিচের বায়ুর ঘনত্ব উপরের বায়ুর চেয়ে হালকা।



মরিচীকা

বিশোষণ

পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিশোষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ফোটনের শক্তি অন্য কোন একটি বস্তু দ্বারা শোষিত বা গৃহীত হয়।

অর্থাৎ, কোনো বস্তু কর্তৃক ফোটনের শক্তি শোষণ করার ঘটনাকে বিশোষণ বলে। কোনো একটি বস্তুর শোষণ ক্ষমতা নির্দেশ করে সেই বস্তুটি কি পরিমাণ আলো শোষণ করতে পারবে।

বিক্ষেপণ

তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিস্তার মাধ্যমে অবস্থিত কণাগুলোর দ্বারা ওই তরঙ্গের বা বিকিরণের শোষণ এবং বিভিন্ন অভিমুখে সেই শোষিত বিকিরণের পুনঃ নিঃসরণের ঘটনাকে বলা হয় বিক্ষেপণ।

আলোর বিক্ষেপণ

সূর্যের আলো বায়ুমন্ডল অতিক্রম করার সময় বায়ুমন্ডলের উপাদান অণু (গ্যাস, জলীয়বাষ্প), পরমাণু এবং ভাসমান ধূলিকণা গুলো (যাদের আকার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় ছোট) ওই আলো শোষণ করে নিজেরা কম্পিত হয় এবং কম্পনরত কণাগুলো গৌণ বা নিস্প্রভ উৎস রূপে আচরণ করে। শোষিত এই আলোকে এলোমেলো ভাবে যেকোনো অভিমূখে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনাকে আলোর বিক্ষেপণ বলে। আলোর বিক্ষেপণ এর ফলেই আকাশ নীল দেখায়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হলে বিক্ষেপণ কম হয়। অপরদিকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হলে বিক্ষেপণ বেশি হয়। অর্থাৎ বিক্ষেপণ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর সম্পর্ক পরস্পরের ব্যস্তানুপাতিক। আলোর মধ্যে বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম আর লাল আলোর সবচেয়ে বেশি। তাই বেগুনি আলোর বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম এবং লাল আলোর বিক্ষেপণ বেশি।

পৃথিবীর আকাশ নীল ও চাঁদের আকাশ কালো দেখার কারণ

সূর্যালোকের বিক্ষেপণের জন্য আকাশের রং নীল হয়। বায়ুমন্ডলের অনুগুলি বা ভাসমান ধূলিকণা সূর্যালোককে বিক্ষিপ্ত করে, র‍্যালের বিক্ষেপণের সূত্রানুযায়ী– বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থঘাতের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তাই লাল আলোর বিক্ষেপণ কম হয়, কিন্তু নীল বা বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এই আলোর বেশি বিক্ষেপণ হয় এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের চোখ বেগুনি অপেক্ষা নীল আলোর জন্য বেশি সংবেদনশীল বলে আমরা পৃথিবী থেকে আকাশকে নীল দেখি। অপরদিকে, চাঁদে কোনো বায়ুমন্ডল নেই তাই সূর্যালোকের কোনো অংশের বিক্ষেপণ হয়ে চাঁদে উপস্থিত দর্শকের কাছে পৌঁছাবে না, ফলে চাঁদের আকাশকে ওই দর্শক কালো দেখবে।

প্রিজম

দুটি ত্রিভুজাকার ও তিনটি আয়তাকার তল দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে।

অর্থাৎ প্রিজম হলো একটি সমসত্ব, স্বচ্ছ মাধ্যম যা পাঁচটি তল দিয়ে ঘেরা। ত্রিভূজাকৃতি প্রিজমের, তিনটি তল আয়তাকার এবং দুটি তল ত্রিভূজাকার। আলোক রশ্মি প্রিজমের যে তলে আপতিত হয় এবং যে তল থেকে নির্গত হয় তাদের প্রতিসারক তল বলে। প্রতিসারক তলকে লম্বভাবে ছেদ করলে যে তল পাওয়া যায়, তাকে প্রিজমের প্রধান ছেদ বলে। প্রিজমের দুটি প্রতিসারক তল যে কোণে মিলিত হয়, তাকে প্রিজমের প্রতিসারক কোণ বলে।

বিজ্ঞানী নিউটন দেখেন যে, সূর্যের রশ্মি প্রিজমের একটি প্রতিসারক তলে আপতিত করলে, ওই সূর্য রশ্মি সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হয়। তাই বলা যায় সাদা আলোক রশ্মি সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মির মিশ্রণ। এখন বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মির প্রতিসারাঙ্ক আলাদা আলাদা। তাই সাদা আলো প্রিজমের একটি প্রতিসারক তলে আপতিত হলে, সাদা আলোর অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মিগুলো বিভিন্ন কোণে বিচ্যুত হয়। ফলে সাদা আলোক রশ্মি ভেঙে গিয়ে সাতটি মৌলিক বর্ণে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে আলোক বিচ্ছুরণ বলে।

আলোর বিচ্ছুরণ

সাদা আলো বা অন্য কোনো বহুবর্ণী (যৌগিক) আলো প্রিজমে বা প্রিজমের মতো প্রতিসারক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে তার উপাদান বর্ণে বিভক্ত হওয়ার ঘটনাকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

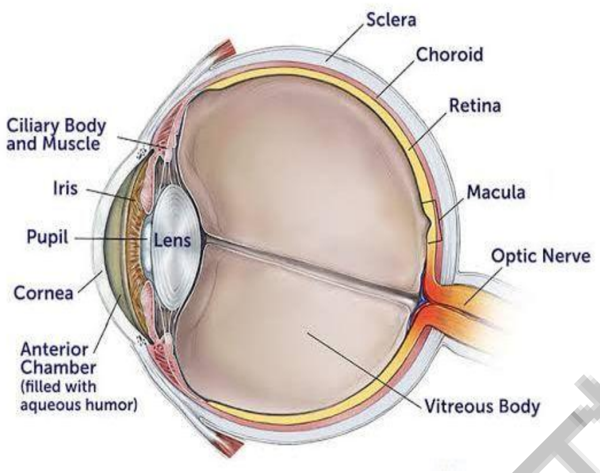
শুন্য মাধ্যমে দৃশ্যমান সাদা কিংবা অন্য কোনো যৌগিক আলোক রশ্মির সব উপাদান বর্ণের গতিবেগ ($3\times10^8\ ms^{-1}$) একই হওয়ার কারণে, শুন্য মাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে না।

সংবেদনশীলতা

উদ্দীপকের প্রভাবে জীবের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে সংবেদনশীলতা বলে।

চোখ প্রাণীর আলোক সংবেদনশীল অঙ্গ ও দর্শনেন্দ্রীয়। প্রাণিজগতের সবচেয়ে সরল চোখ কেবল আলোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির পার্থক্য করতে পারে। উন্নত প্রাণীরা তথা মানুষ তাদের অপেক্ষাকৃত জটিল গঠনের চোখগুলো দিয়ে আকৃতি ও বর্ণ পৃথক করতে পারে। অনেক প্রাণীর (এদের মধ্যে মানুষ অন্যতম) দুই চোখ একই তলে অবস্থিত এবং একটি মাত্র ত্রিমাত্রিক দৃশ্য গঠন করে। আবার অনেক প্রাণীর দুই চোখ দুইটি ভিন্ন তলে অবস্থিত ও দুইটি পৃথক দৃশ্য তৈরি করে (যেমন- খরগোশের চোখ)।

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশ



শ্বেতমন্ডল (sclera)

এটা চোখের আচ্ছাদনকারী সাদা অংশ। এটা চোখে বহীরাবরকের পেছনের দিকের পাঁচ থেকে ছয় ভাগ স্থান জুড়ে অবস্থিত। এটা ও ভিতরের তরল পদার্থগুলো (অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার) মিলে চোখের সূক্ষ্ম অংশগুলোকে রক্ষা করে। এটি সাদা ও অস্বচ্ছ এবং সাদা বর্ণের কোলাজেন তন্তু দ্বারা গঠিত যার ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারে না।

কর্নিয়া (cornea)

এটা গম্বুজ আকারের স্বচ্ছ পর্দা যা চোখের সামনের অংশ ঢেকে রাখে। এটি চোখে বহীরাবরকের সামনের দিকের এক থেকে ছয় ভাগ স্থান জুড়ে অবস্থিত। এটা স্বচ্ছ, কারণ এতে কোন রক্তজালিকা নেই। চোখ প্রতিস্থাপন (eye transplant) বলতে আসলে কর্নিয়ার প্রতিস্থাপন বুঝায়।

অ্যাকুয়াস হিউমার (aqueous humor)

এটা জলীয় পদার্থের মত তরল পদার্থ যা সিলিয়ারি বডি থেকে উৎপন্ন হয়। চোখের সামনের অংশ (লেন্স এবং কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অংশ) এই তরলে পূর্ণ থাকে।

আইরিশ (Irish)

এটা চেখের রঙিন অংশ যা অনেকটা আংটির মত। এটা বিভিন্ন রঙের হয়। যেমন- বাদামি, সবুজ, নীল ইত্যাদি। আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে আইরিশ সংকোচিত বা প্রসারিত হয়। এতে পিউপিলের আকার পরিবর্তিত হয় এবং লেন্স ও রেটিনায় আপতিত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও দুই ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে আইরিশ গঠিত।

পিউপিল (pupil)

এটা হল আইরিশের মাঝের খোলা অংশ যেখান দিয়ে আলো লেন্সে প্রবেশ করে। এটার আকার আইরিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করে।

লেন্স বা অভিক্ষেপ (lens)

রেটিনার উপর আলোক রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে। এতে রক্ত সরবরাহ নেই। এর আকার সিলীয় পেশী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি ক্রিস্টালাইন প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এটা আইরিশের মাংসপেশি দ্বারা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এর ফলে আমরা সহজেই কাছের ও দূরের জিনিস দেখতে পাই। (উল্লেখ্য যে কাছের জিনিস দেখতে আমাদের চোখের লেন্স প্রসারিত হয় এবং দূরের জিনিস দেখতে আমাদের চোখের লেন্স সঙ্কুচিত হয়।)

ভিট্রিয়াস হিউমার (vitreous humor)

এটা জেলির মত পদার্থ যা চোখের বেশিরভাগ অংশ পূর্ণ করে রাখে (লেন্সের পিছন থেকে রেটিনা পর্যন্ত)।

কোরয়েড বা কৃষ্ণ মণ্ডল (choroid)

এই শ্বেতমন্ডল ও রেটিনার মধ্যবর্তী রক্তবাহিকা সমৃদ্ধ ও মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর। মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি কালো দেখায়। এটা রেটিনাতে রক্ত সরবরাহ করে এবং রেটিনা হতে আগত অতিরিক্ত আলো শোষণ করে নেয়। এর ভিতরে রয়েছে আইরিশ ও লেন্স। এটি একটি ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর।

রেটিনা (retina)

এটা হল চোখের আলোক সংবেদী অংশ। এটা আলোক রশ্মিকে তড়িৎ সংকেতে (electrical signal) রূপান্তর করে দর্শন স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। রেটিনায় দুই ধরনের আলোকসংবেদী কোষ (photoreceptor) থাকে। এরা হলো– রডকোষ (rod) এবং কোনকোষ (cone)। রডকোষ আবছা বা মৃদু আলোতে দেখতে সাহায্য করে, আর কোনকোষ স্বভাবিক বা উজ্জ্বল আলোতে দেখতে সাহায্য করে। কোনকোষ থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন রঙ চিনতে পারি এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের রঙিন বস্তু দর্শনে কোনকোষ গুলো সাহায্য করে।

ফোবিয়া (fovea)

রেটিনার মাঝামাঝি এবং অন্ধবিন্দুর কাছাকাছি একটি খাঁজ দেখা যায়। এটাই ফোবিয়া। এখানে প্রচুর কোনকোষ থাকে কিন্তু কোন রডকোষ থাকে না। আমাদের দর্শনানুভূতির বেশিরভাগই এর উপর নির্ভর করে।

অন্ধবিন্দু (optic disk or blind spot)

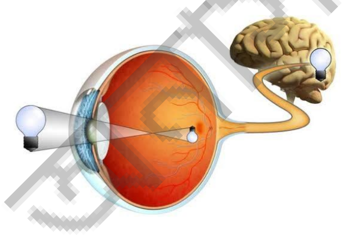
এটি দর্শন স্নায়ুর প্রান্তবিন্দু। এখানে কোন আলোকসংবেদী কোষ (রড ও কোন) থাকে না।

দর্শন স্নায়ু (optic nerve)

এটা মানুষের দ্বিতীয় করোটিক স্নায়ু (cranial nerve)। এর মাধ্যমে চোখ থেকে আলোকসংকেত মস্তিষ্কে পৌছায়।

মানুষ যেভাবে দেখে

মানুষের চোখ দেখতে একটা বলের মত যার সামনের দিকে থাকে পিউপিল বা চোখের মণি। চোখের মণি একটি ছিদ্রের মত কাজ করে যে ছিদ্র দিয়ে আলো চোখের ভেতরে ঢোকে। পিউপিলের সমিনে থাকা আইরিশ আলোর তীব্রতা অনুযায়ী ছিদ্রের আকার ঠিক করে। এতে করে দেখার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু আলো চোখে ঢুকতে পারে। মণির ঠিক পেছনে থাকে লেন্স, এর কাজ হচ্ছে আগত আলোক রশ্মিকে প্রতিসরিত করে চোখের ভেতরে পেছনের দিকে রেটিনার ওপর ফেলা। রেটিনা একটি আলোক সংবেদী পর্দার মত কাজ করে, এটি বুঝতে পারে এর ওপর কোথায় কতটুকু এবং কি রঙের আলো পড়ছে। এটি এই আলোক সংকেতকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। মস্তিষ্ক সেই সংকেত থেকে বস্তুর ছবি বুঝতে পারে। ব্যাপারটি নিচের ছবিতে দেখানো হলো—



ছবিতে খেয়াল করে দেখলে বুঝা যায়, কোনকিছু আসলে যেভাবে থাকে, রেটিনাতে পড়ে তার উল্টো হয়ে। রেটিনা থেকে রুপান্তরকৃত তড়িৎ সিগন্যাল বাইপোলারকোষ, গ্যাংলিয়ন কোষ এবং অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অপটিক লোবের দৃষ্টি কেন্দ্র (Visual Cortex) -এ পৌঁছায়। এখানে রেটিনা থেকে প্রাপ্ত উল্টা প্রতিবিম্বের তথ্য অত্যান্ত জটিল প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষিত হওয়ার ফলে মানুষ বস্তুটিকে সোজা ও রঙিন দেখতে পায়। অর্থাৎ দর্শন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং এটি পাঁচটি ধাপে হয়ে থাকে। যথা—

1. চোখে আলোর প্রবেশ
2. রেটিনাতে প্রতিবিম্ব গঠন
3. প্রতিবিম্ব গঠনকারী রশ্মির তড়িৎ সিগন্যালে রূপান্তর
4. প্রতিবিম্ব সম্পর্কে স্নায়ু অনুভূতি তথা তড়িৎ সিগন্যাল মস্তিষ্কে প্রেরণ
5. মস্তিষ্কের মাধ্যমে স্নায়ু অনুভূতির বিশ্লেষণ ও দর্শন।

মানুষ রঙ যেভাবে বুঝতে পারে

মানুষের চোখ এবং মস্তিস্ক একত্রে আলোকে ট্রান্সলেট করে রঙে পরিণত করে। চোখের ভেতরে থাকা আলোক সংবেদী কোষ (রেটিনা) স্নায়ুর মাধ্যমে মানব মস্তিস্কে বার্তা প্রেরণ করে থাকে এরপর মস্তিস্ক সেটা জটিল প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

মানব চক্ষুর রেটিনা মিলিয়ন মিলিয়ন আলোক সংবেদী কোষ দ্বারা আবৃত। এর কিছু কোষ হচ্ছে রড কোষ, আবার কিছু কোষ হচ্ছে কোণ কোষ। এই আলোক সংবেদী স্নায়ুমুখগুলো মানব মস্তিস্কে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং অপটিক নার্ভের (দর্শন স্নায়ু) মাধ্যমে মস্তিষ্কের কর্টেক্সে পাঠায়। এভাবেই আসলে মানুষের মাঝে রঙের অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

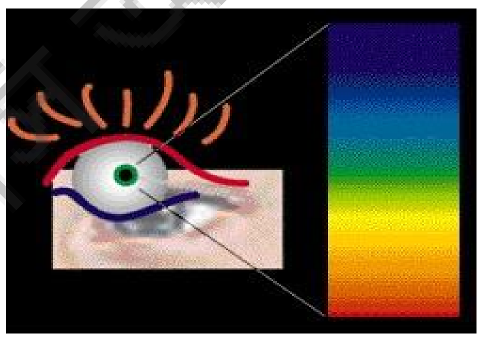
রঙ প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর নিজস্ব ধর্ম নয়। কোনকিছু থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসা আলোকে রঙ বলে মানুষের কাছে মনে হয়।

দৃশ্যমান আলোতে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের মিশ্রণ তথা বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বর্ণালী থাকে। কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে বস্তুটি আলোর কিছু কম্পাঙ্কের বর্ণালী শোষণ করে, আর কিছু প্রতিফলন করে। কখনো কখনো প্রায় পুরোটাই শোষন করে বা প্রতিফলন করে। রঙ নির্ভর করে এই প্রতিফলিত আলোর কম্পাঙ্কের উপর। যেমন সাদা রঙের বস্তু সব কম্পাঙ্ক প্রতিফলন করে, কালো বস্তু সব কম্পাঙ্ক শোষণ করে। লাল বস্তু শুধু লাল আলো প্রতিফলন করে বাদবাকি টুকু শোষণ করে ফেলে।



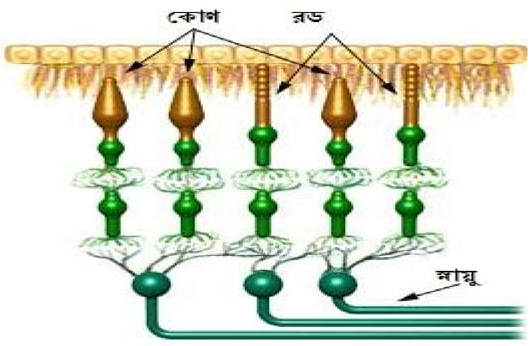
অনুরূপ ঘটনা ঘটে অন্যান্য রঙের বস্তুর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ বা তলের উপরে আলো পড়লে যদি বস্তুটি আলোর সবটুকু শোষণ করে কোন একটা নির্দিষ্ট রঙ শোষণ করতে না পেরে সেই রঙটিকে প্রতিফলিত করে দেয়, তাহলে মানুষ বস্তুটিকে সেই নির্দিষ্ট রঙের দেখে। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সাদা এবং কালো বলতে কোন রঙ নেই। সাদা হচ্ছে সকল রঙের সমষ্টি আর কালো হচ্ছে সকল রঙের অনুপস্থিতি।

মাত্র একটি কম্পাঙ্ক দিয়ে তৈরী আলোকে একবর্ণী আলো বলে। একবর্ণী অর্থ এক বর্ণ বিশিষ্ঠ হলেও এটি আসলে একটি রঙের আলো বোঝায় না, বোঝায় একটি কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্ক বাড়ার সাথে সাথে এই আলোর রঙ কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানী, নীল, বেগুনি ইত্যাদি হয়।

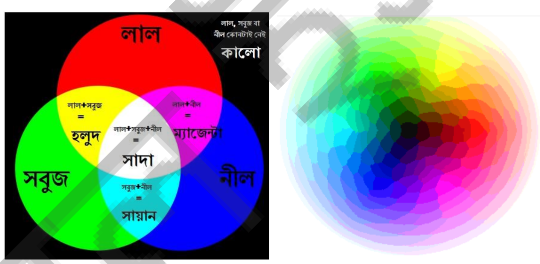


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রেটিনাতে রড কোষ এবং কোণ কোষ নামে দুই রকমের মিলিয়ন মিলিয়ন আলোক সংবেদী কোষ থাকে। রড কোষগুলো সব এক রকম। এগুলো অল্প তীব্রতায় কর্যকর হয়, এগুলো শুধু আলোর তীব্রতা বুঝতে পারে, কিন্তু কম্পাঙ্ক বুঝতে পারে না। কোণ কোষ সংবেদনশীল হতে হলে আলোর তীব্রতা একটু বেশী হতে হয় কিন্তু এরা রঙের প্রতি সংবেদনশীল। রড কোষ কার্যকর হয় রাতের কম আলোতে তখন হালকা অন্ধকারে দেখা গেলেও রঙ বোঝা যায় না।

আর কোণ কোষ তীব্র আলোতে কার্যকর হয় বিধায় দিনের আলো তথা সাধারণ আলোতে বস্তুর রঙ বুঝা যায়। সকল কোণ কোষ তিন প্রকারের হয়ে থাকে যারা তিন রকমের কম্পাঙ্কের বর্ণালীর রঙের প্রতি সাড়া দেয়।



অল্প কম্পাঙ্কের কোণ সাড়া দেয় লাল আলোয়, মধ্যম কম্পাঙ্কের কোণ সাড়া দেয় সবুজ আলোয়, উচ্চ কম্পাঙ্কের কোণ সাড়া দেয় নীল আলোয়। তাই মানুষ রঙ দেখে এই তিন রঙের মিশ্রণ হিসাবে। এই তিনটি রঙকে প্রাথমিক রঙ বলা হয়। মানুষ অন্য যেকোনো রঙ দেখে এই তিন রঙের যোগমূলক এবং বিয়োগমূলক মিশ্রণ পদ্ধতিতে। এভাবে মানব চক্ষু প্রায় দশ মিলিয়ন রঙকে পৃথকভাবে সনাক্ত করতে পারে। যখন তিনটি রঙের সবকয়টি সমানভাবে মিশে যায়, তখন সেটি হয় সাদা। আর কোন রঙ না থাকলে সেটি হয় কালো।



রঙের যোগমূলক ও বিয়োগমূলক মিশ্রণ

বর্ণচক্র

বর্ণালীতে মানুষের দৃষ্টির সংবেদনশীলতার গড় মান অনুসারে বর্ণের ক্রম পরিবর্তনের ধারাকে চক্রাকারে সাজালে যে চক্র পাওয়া যায় তাকে বর্ণচক্র বলে।



বর্ণচক্র

বর্ণালি অনুসারে বর্ণের ক্রম পরিবর্তনের ধারায় যত বর্ণ পাওয়া যায়, তাদের যেকোনো দুটি বর্ণের খুব নিকটবর্তী যোগিক বর্ণ মানুষ আলাদা করে শনাক্ত করতে পারে না। কিন্তু বর্ণচক্রের নির্দিষ্ট কয়েকটি রেঙ্গকে মানুষ আলাদা বর্ণ হিসেবে শনাক্ত করতে পারে। বর্ণ চক্রে সমদূরত্বে তিনটি বর্ণ পাওয়া যায়। যাদের কে প্রাথমিক বা মৌলিক বর্ণ বলে। এবং বাকি সকল বর্ণকে বলা হয় মিশ্র বা যৌগিক বর্ণ। মৌলিক বর্ণ তিনটি হলো—

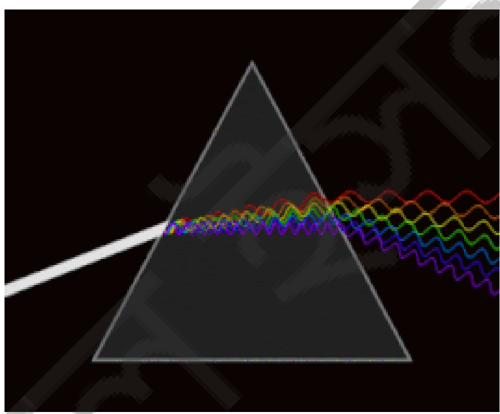
1. নীল
2. হলুদ
3. লাল

দৃশ্যমান বর্ণালী

দৃশ্যমান বর্ণালি বা দৃশ্য বর্ণালি বা আলোক বর্ণালি হচ্ছে তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর সেই অংশ যা মানুষের চোখে দৃশ্যমান অর্থাৎ যা মানুষের চোখ চিহ্নিত করতে পারে। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সীমার তড়িৎচৌম্বক বিকিরণকে দৃশ্যমান আলো বা শুধু আলো বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের চোখ সাধারণত ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সাড়া দেয়।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্কের বিস্তার মোটামুটি ৪০০ টেরাহার্টজ থেকে ৭৯০ পর্যন্ত। অনেক সময়, যখন মানুষের দৃষ্টির ক্ষেত্র মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়, তখন অন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে, বিশেষত সন্নিকট অবলোহিত তরঙ্গ (৭৬০ ন্যানোমিটারের বেশি এবং অতিবেগুনী (৩৮০ ন্যানোমিটারের কম) রশ্মিকেও আলোক তরঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সাদা আলো মূলত সাতটি বর্ণের মিশ্রণ। সূর্যের সাদা আলো যদি কোনো প্রিজমের ভেতর দিয়ে চালনা করা হয় তাহলে তা সাতটি বর্ণের আলোতে বিশ্লিষ্ট হয়। এভাবে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বর্ণের আলোর এ সমাহারকে দৃশ্যমান বর্ণালি বলা হয়।



সাদা আলোর বিচ্ছুরণে প্রাপ্ত বর্ণালির মধ্যে যে সাতটি বর্ণ থাকে, সেই বর্ণগুলির ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরগুলিকে, বর্ণালিতে পাওয়া সাতটি বর্ণের ক্রম অনুযায়ী সাজালে 'VIBGYOR' শব্দটি পাওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে বাংলা নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে সাজালে 'বেনীআসহকলা' শব্দটি পাওয়া যায়। বর্ণগুলো হচ্ছে—

1. বেগুনি
2. নীল
3. আকাশি (হালকা নীল)
4. সবুজ
5. হলুদ
6. কমলা
7. লাল

রংধনুর মধ্যে এই দৃশ্যমান আলোক বর্ণালির বিভিন্ন ব্যান্ড খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়, যেখানে (যদি দেখা যেত) অবলোহিত তরঙ্গ লাল বর্ণের নিচে থাকে এবং বেগুনি বর্ণের ঠিক পরেই থাকে অতিবেগুনী রশ্মি। এই বর্ণালীর সবশেষে থাকে বেগুনী বর্ণ ও সব থেকে ওপরে থাকে লাল বর্ণের আলো।

তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ যখন কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। মানুষের মস্তিষ্কের অপটিক্যাল লোব (optical lobe) এই কাজে সাহায্য করে। অন্ধকার হলে কোন আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে না বিধায় আমরা কালো ছাড়া কিছুই দেখতে পারি না। অন্ধকারের কালোটা কোন বর্ণ নয় বরং এটি একটি দশা (Phrase)। কিছুই না থাকলে সেটা আমাদের চোখ কালো করে দেখতে পায় যা আমাদের মস্তিষ্ক কালো বর্ণ বলে ধরে নেয়। তাই, অন্ধকারটা একটা ইল্যুশন বা বিভ্রান্তি।

দৃশ্যমান বর্ণালি ছাড়া অন্য তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর অন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে মানুষ অনুভব করতে পারে না। তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের প্রাকৃতিক উৎস গুলি সমগ্র বর্ণালি সৃষ্টি করে। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা প্রয়োজন মতো বিস্তৃত পরিসরে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তৈরী করতে পারি। অপটিক্যাল ফাইবারে যে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয় তা সর্বদা দৃশ্যমান বর্ণালি নাও হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই তা অবলোহিত তরঙ্গ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মড্যুলেশন (Modulation) পদ্ধতি বেতার তরঙ্গের মতোই।

দৃশ্যমান তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন ব্যান্ডের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক ও শক্তি

দৃশ্যমান আলোক বর্ণালির বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঠিক সমবায় হল সাদা আলো। সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ৪০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাতটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পরে। যথা—

বর্ণ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য ন্যানোমিটার (nm) প্রায়	কম্পাঙ্ক টেরাহার্টজ (THz) প্রায়	ফোটনের শক্তি ইলেক্ট্রো-ভোল্ট (eV) প্রায়
বেগুনি	৪০০–৪৫০	৬৭০–৭৫০	২.৭৫–৩.২৬
আকাশি + নীল	৪৫০–৪৯০	৬১০–৬৭০	২.৫০–২.৭৫
সবুজ	৪৯০–৫৬০	৫৪০–৬১০	২.১৭–২.৫০
হলুদ	৫৬০–৫৯০	৫১০–৫৪০	২.১০–২.১৭
কমলা	৫৯০–৬৩৫	৪৮০–৫১০	২.০০–২.১০
লাল	৬৩৫–৭০০	৪৩০–৪৮০	১.৬৫–২.০০

আলোক তরঙ্গ বা দৃশ্যমান বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন রেঞ্জ থেকে বোঝা যায়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে আলোর তীব্রতাও তত বেশি হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে আলোর তীব্রতাও তত কমে যাবে। এ কারণে সাধারণত স্ট্রিট সিগন্যালে লাল আলো ব্যবহার করা হয়।

দৃশ্যমান বর্ণালী আবিষ্কারের ইতিহাস

১৭ শতকের দিকে স্যার আইজাক নিউটন সূর্যের সাদা আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে চালনা করে দেখেছিলেন যে সাদা আলো থেকে সাতটি বর্ণ তৈরি হয়। এগুলো হলো বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এভাবে বর্ণালী আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের কিছুকাল পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ওয়ালস্টোন সাত রঙের বর্ণালীর মধ্যে কিছু কালো রেখা খুঁজে পান। পরবর্তীতে এই কালো রেখা নিয়ে গবেষণা করেন জার্মান বিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনহোফার। সূর্যালোকের এই কালো বর্ণালীকে বিজ্ঞানীর নামানুসারে নামকরণ করা হয় ফ্রনহোফার বর্ণালী। ফ্রনহোফারের মৃত্যুর পর বিজ্ঞানী কার্শফ ও বুনসেন বর্ণালী নিয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করেন। তবে তাঁদের গবেষণার বিষয় সৌর বর্ণালী ছিল না। তাঁরা সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত পানিতে কাপড় ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তারা দেখেন হলুদ বর্ণ বাদে অন্য সাতটি রঙ এর অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীতে আরো সামান্য পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, হলুদ বর্ণালীটি এসেছে সোডিয়াম থেকে, ক্লোরিন থেকে নয়। এভাবে তারা বর্ণালী ব্যবহার করে মৌল শনাক্তকরণ এর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কারণ ঘটনা থেকে এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রতিটি মৌলেরই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণালী বিদ্যমান এবং একটি মৌলের বর্ণালী অন্য মৌলের বর্ণালীর সাথে মিলবে না।

দৃশ্যমান বা আলোক বর্ণালীর প্রকারভেদ

শুদ্ধ বর্ণালী

প্রিজমের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো চালনা করার পরে যদি আলোর সাতটি বর্ণ (বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল) স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তবে সে ধরনের বর্ণালী হলো শুদ্ধ বর্ণালী। এক্ষেত্রে প্রিজম হতে প্রতিসরিত আলো অর্থাৎ সাতটি বর্ণ আলাদাভাবে পর্দায় পড়ে। সাদা রশ্মির মাঝের বর্ণগুলো ক্রমানুযায়ী অবস্থান করে।

অশুদ্ধ বর্ণালী

এক্ষেত্রে সাদা বর্ণের আলো সমূহ আলাদাভাবে পর্দায় না পড়ে এক বর্ণের আলো অন্য বর্ণের আলোর উপরে উপরিপাতিত হয়। ফলে আলোক বর্ণসমূহ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। এই বর্ণালীকে অশুদ্ধ বর্ণালী বলে।

উজ্জ্বল বর্ণালী

পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন উচ্চ কক্ষপথ হতে নিম্ন কক্ষপথে আসার সময় যে বর্ণালীর উদ্ভব হয় তাকে উজ্জ্বল বর্ণালী বলা হয়।

অনুজ্জ্বল বর্ণালী

অপরদিকে, পরমাণুতে কোনো ইলেক্ট্রন যখন নিম্ন শক্তিস্তর হতে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে তখন ইলেক্ট্রনটি শক্তি শোষণ করে। এর ফলে যে বর্ণালীর সৃষ্টি হয় তাকে অনুজ্জ্বল বর্ণালী বলে।

রেখা বর্ণালী

কোনো গ্যাসের মধ্যে লঘু চাপে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ প্রয়োগ করলে সেই গ্যাসীয় পরমাণুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়। ফলে রশ্মি বিকিরিত হয়। একে রেখা বর্ণালী বা পারমাণবিক বর্ণালী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গুচ্ছ বর্ণালী

কোনো গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তড়িৎচৌম্বক রশ্মি প্রয়োগ করা হলে বর্ণালীতে কাছাকাছি কয়েক গুচ্ছ রেখা দেখা দেয়। এ ধরনের বর্ণালীকে গুচ্ছ বর্ণালী বলা হয়। এর অপর নাম আণবিক বর্ণালী।

নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী

কোনো কঠিন বস্তুতে মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত করা হলে উক্ত উত্তপ্ত পদার্থ বর্ণালী নিঃসরণ করে। একে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী বলে।

উপরোক্ত বর্ণালীর পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বর্ণালী দেখা যায়। যেমন— তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী, NMR বর্ণালী, হাইড্রোজেন বর্ণালী, মাইক্রোওয়েভ বর্ণালী, কম্পন বর্ণালী, দৃশ্যমান বর্ণালী, ESR বর্ণালি, ইলেক্ট্রন বর্ণালী, নিকট-অবলোহিত বর্ণালী।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্ণালির মধ্যে পার্থক্য

শুদ্ধ বর্ণালি	অশুদ্ধ বর্ণালি
শুদ্ধ বর্ণালিতে সাতটি বিভিন্ন বর্ণ পৃথক পৃথকভাবে পর্দার ওপর পড়ে।	অশুদ্ধ বর্ণালিতে সাতটি বিভিন্ন বর্ণ পৃথক পৃথকভাবে পর্দার ওপর পড়ে না, একটি বর্ণের ওপর অপর বর্ণ পড়ে।
শুদ্ধ বর্ণালিতে সাতটি বিভিন্ন বর্ণ পর্দায় খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।	অশুদ্ধ বর্ণালিতে সাতটি বিভিন্ন বর্ণ পর্দায় অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।
সাদা রশ্মির মধ্যস্থ মৌলিক বর্ণগুলি ক্রম অনুযায়ী পর পর অবস্থান করে।	মৌলিক বর্ণগুলি ক্রম অনুযায়ী পর পর সজ্জিত থাকে না।

পদার্থে বর্ণালীর প্রভাব

বর্ণালীর ফলে পদার্থে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য এর সৃষ্টি হয়। যেমন—

প্রতিপভা

তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ শোষণ করার ফলে কিছু পদার্থে প্রতিপভা দেখা দেয়। অর্থাৎ, উক্ত পদার্থটি শোষিত আলোকরশ্মি নির্গমন করতে থাকে যা শোষিত আলোকরশ্মির চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয়, একে প্রতিপভা বলে।

অনুপ্রভা

রশ্মি শোষন করার পরে সরিয়ে নেওয়ার পরেও (সাদা আলো হতে) কিছু পদার্থ আলো দিতে থাকে। এ ঘটনাকে অনুপ্রভা বলে। MgS এ ধর্ম প্রদর্শন করে।

স্বতঃপ্রভা

কিছু পদার্থ দিনের বেলায় সৌর শক্তি শোষন করে রাতের বেলায় আলো বিকিরণ করতে থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বিকিরণকাল নির্দিষ্টও থাকে না। এই ঘটনাকে স্বতঃপ্রভা বলা হয়।

আকাশের রংধনু (Rainbow)

সাদা আলোর বিচ্ছুরণের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত হল আকাশের রংধনু। সাধারণত বৃষ্টির পর আকাশে অনেক জলকণা ভাসমান অবস্থায় থাকে। সূর্যরশ্মির সাদা বর্ণের আলো বৃষ্টির জলের ফোঁটার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিসরণের ফলে সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণ হয়। এখানে আকাশে ভাসমান জলকণাগুলিই প্রিজমের কাজ করে। ফলে আকাশে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোক ব্যান্ড গঠন করে। একেই রংধনু বলে। রংধনুকে সর্বদা সূর্যের বিপরীত দিকের আকাশে দেখতে পাওয়া যায়।

আলোর আপেক্ষিক তত্ব

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যে আলো দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী। আলো কখনো কখনো তরঙ্গের মত আচরণ করে, আবার অন্য সময় তার আচরণ কণাধর্মী।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করে আসছে। মিশরীয় এবং গ্রিক দার্শনিকেরা মনে করতেন আমাদের চোখ হতে আলো কোনো বস্তুর উপর পড়লে আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। নেহায়েত অনুমান নির্ভর এ ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না বলে এ ধারণা কখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি।

ইসলামী স্বর্ণযুগের একজন মুসলিম গনিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী **আলি হাসান ইবনুল হাসান ইবনুল হায়সাম**, পশ্চিমা বিশ্বে যিনি আল হাজেন নামে পরিচিত। তাকে প্রায়শ আলোক বিজ্ঞানের জনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তিনি আলোকবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে দর্শনানুভূতির ব্যাখ্যায়। তার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কাজ হচ্ছে ১০১১ সাল হতে ১০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সাত খণ্ডে রচিত আলোকবিজ্ঞানের উপর গবেষণা গ্রন্থ 'কিতাবুল মানাজির' যার ল্যাটিন নাম 'অপটিকা থেজারাস'।

দশম শতকের শেষের দিকে সর্বপ্রথম হাসান ইবনুল হায়সাম'ই দর্শনানুভূতির ব্যাখ্যায় প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আলো বস্তু হতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসে বলেই তা দৃশ্যমান হয়। তিনি এটাও আলাদা করতে পেরেছিলেন দর্শনানুভূতির কেন্দ্র চোখে নয়, বরং মস্তিষ্কে।

আলোর বিভিন্ন তত্ব

দীপ্তিমান বস্তু থেকে আলো কীভাবে আমাদের চোখে আসে তা ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চারটি তত্ব প্রদান করেছেন। এ চারটি তত্বকে একত্রে আলোর আপেক্ষিক তত্ব বলে।

তত্বগুলো হলো—

1. কণা তত্ব (Corpuscular Theory)
2. তরঙ্গ তত্ব (Wave Theory)
3. তাড়িত চৌম্বক তত্ব (Electromagnetic Theory)
4. কোয়ান্টাম তত্ব (Quantum Theory)

কণাতত্ব

স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৭২ সালে আলোর কণাতত্ব প্রদান করেন। এ তত্ব অনুসারে কোনো উজ্জ্বল বস্তু থেকে অনবরত ঝাঁকে ঝাঁকে অতি ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। এ কণাগুলো প্রচণ্ড বেগে সরলরেখা বরাবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন আমাদের চোখে গিয়ে আঘাত করে তখন ঐ বস্তু সম্পর্কে আমাদের দর্শনানুভূতি হয়। এ কণাগুলোর বিভিন্ন আকারের জন্য বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়।

নিউটনের কণাতত্ব বা 'করপাসকুলার থিওরি' এর মূল বক্তব্য মূলত তিনটি–

1. দৃশ্যমান আলো মূলত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গতিশীল কণার সমন্বয়।
2. বস্তুজগতের অন্যান্য বস্তুর মত আলোক কণাও পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম মেনে চলে।
3. কণাগুলোর আকার যথেষ্ঠ ছোট বলে এরা পরস্পরকে বিক্ষিপ্ত করে না।

কণা তত্ত্বের সাহায্যে আলোর ঋজুগতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি আলোকীয় ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ব্যতিচার, সমবর্তন, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি আলোকীয় ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা এ তত্ত্বের সাহায্যে করা সম্ভব হয় না।

উল্লেখ্য যে, স্যার আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক কণা তত্ত্বের অবতারণার প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনুল হায়সাম এর আলোচিত 'কিতাবুল মানাজির' গ্রন্থ থেকে আলোর কণা তত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায়। যা প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং একটি পিনহোল লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোর নির্গমনের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানী ইবনুল হায়সাম বলেন যে এই (আলোক) রশ্মি হালকা কণা দ্বারা গঠিত হয়।

তরঙ্গ তত্ত্ব

১৬৭৮ সালে হাইগেন সর্বপ্রথম আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ইয়ং, ফ্রেনেল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা এ তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে আলো ইথার নামে এক কাল্পনিক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে 3×10^8 ms^{-1} বেগে সঞ্চালিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ইথারকে কল্পনা করা হয় একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমে রূপ যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব কম এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নির্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এ তত্ত্বের সাহায্যে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, ব্যতিচার ও অপবর্তন ব্যাখ্যা করা গেলেও সমবর্তন, আলোক তড়িৎক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। মাইকেলসন ও মর্লি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন ইথার বলে কিছুই নেই।

তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব

১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল আলোর তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের অবতারণা করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে যখন গতিশীল চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের উদ্ভব হয়, যা তরঙ্গ আকারে 3×10^8 ms^{-1} বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং এর সঞ্চলনের জন্য ইথারের কল্পনা প্রয়োজন হয় না।

কোনো কোনো ধাতুর উপর আলো পড়লে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রন নির্গত হয় যাকে ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলে। আলোর তরঙ্গ ধর্মের সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে আলোকশক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গুচ্ছ বা প্যাকেজ আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এই সর্ব নিম্নমানের শক্তি সম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।

১৯০৫ সালে আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে আইনস্টাইন উল্লিখিত ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন, সেজন্য তাকে (আইনস্টাইন) ১৯২১ সালে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

তরঙ্গ–কণা দ্বৈততা

তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা হল কোনো তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের একইসঙ্গে তরঙ্গ ও কণা উভয়ের অনুরূপ আচরণ করার প্রবণতা। কেবলমাত্র তরঙ্গধর্ম বা কেবলমাত্র কণাধর্ম ব্যবহার করে কোনো তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের আচরণ সমূহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই এই তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গগুলির অপবর্তন, সমাবর্তন, প্রতিফলন, বিচ্ছুরণ, প্রতিসরণ প্রভৃতি ধর্ম সমূহের সঠিক কারণ জানতে হলে কাজে লাগাতে হবে তরঙ্গধর্ম। আবার আলোক তড়িৎ ক্রিয়া, কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ, তাপের প্রভাবে বর্ণ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দেয় তরঙ্গের কণাধর্ম। তরঙ্গ-কণা দ্বৈতটি সম্পূর্ণরূপে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ধারণা। এটি কোয়ান্টাম স্কেল অবজেক্টের আচরণকে পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্য সনাতন বলবিদ্যার শুধুমাত্র 'কণা' বা 'তরঙ্গ' এর ধারণার অক্ষমতা প্রকাশ করে।

মূলত, কিছু আলোকিয় ঘটনা আলোর কণারূপকে প্রকাশ করে তেমনি অন্যান্য আলোকিয় ঘটনা আবার আলোর তরঙ্গ ধর্মকে প্রকাশ করে। ফলে আলো কণা না তরঙ্গ এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিতর্কের অবসান কটে। তবে কখনোই এক সঙ্গে আলো কণা এবং তরঙ্গ নয়।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন লিখেছেন: "আমার মনে হয় যে আমাদের কখনো কখনও একটি তত্ব (তরঙ্গতত্ব) এবং কখনও কখনও অন্যটি (কণাতত্ব) ব্যবহার করতে হবে। যদিও মাঝে মাঝে আমরা এই দুটি তত্বকেই একত্রে ব্যবহার করতে পারি। আমরা একটি নতুন ধরনের পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছি। আমাদের বাস্তবে দুটি দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয় আছে; এই উভয় প্রকার ঘটনার ব্যাখা কণাতত্ব বা তরঙ্গতত্ব কেউই একা করতে পারে না বরং উভয়ে একসঙ্গে করতে সক্ষম।"

তাই বলা যায়, আলো কখনও তরঙ্গের মত আচরণ করে, আবার অন্য সময় তার আচরণ কণাধর্মী। ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার মতো ঘটনা আলোর কণারূপকে উৎঘাটন করে। আবার ব্যাতিচার, সমবর্তন, অপবর্তন ইত্যাদি ঘটনা আলোর তরঙ্গ ধর্মকে প্রকাশ করে। ম্যাক্সবর্নের ব্যবস্থা অনুসারে এখন মনে করা হয় অবস্থা বিশেষ আলোক কণা অথবা তরঙ্গরূপে আচরণ করে।

আলোকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীদের কল্পিত বিতর্কসভা

নিউটন: আলো অবশ্যই কণা দিয়ে তৈরি।

হাইগেন: হতেই পারে না, আমি বলছি আলো এক প্রকার তরঙ্গ।

ম্যাক্সওয়েল: ঠিক, আলো তরঙ্গই বটে, তবে হাইগেন সাহেব কিছু ভুল বলেছিলেন, আলো আসলে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক: আপনারাই ঠিক মনে হয়, কিন্তু আমি যে দেখলাম আলো একটু কণার মতও আচরণ করে।

আইন্সটাইন: আলো কণা এবং তরঙ্গ, দুইটাই।

আলোক উৎস বা আলোকপ্রভব

যে সকল বস্তু থেকে আলো বিকিরণ করে, তাদের আলোক উৎস বা আলোক প্রভব বলে।

এদের মধ্যে সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি হলো আলোর স্বাভাবিক উৎস এবং জ্বলন্ত কাঠ, কয়লা, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি হল আলোর কৃত্রিম উৎস।

আলোক উৎসের প্রকারভেদ

আলোক উৎস দুই প্রকার। যথা—

1. স্বপ্রভ বা স্বয়ংপ্রভ উৎস (Luminous Source)
2. নিষ্প্রভ উৎস (Non-luminous Source)

স্বপ্রভ বা স্বয়ংপ্রভ উৎস

যে সকল বস্তু নিজেই নিজের উৎস থেকে আলো বিকিরণ করে তাদের স্বপ্রভ উৎস বলে। যেমন, পৃথিবীতে আলোর প্রধান উৎস হল সূর্য। এছাড়া নক্ষত্র, জ্বলন্ত বাতি বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি হল স্বপ্রভ বা স্বয়ংপ্রভ আলোক উৎস।

নিষ্প্রভ উৎস

যে সকল বস্তুর নিজস্ব আলো নেই, যারা স্বপ্রভ বস্তুর আলোয় দৃশ্যমান হয়ে আলো বিকিরণ করে, তাদের নিষ্প্রভ বস্তু বলে। যেমন, পৃথিবীতে অধিকাংশ বস্তুই নিষ্প্রভ বস্তু। চাঁদ, টেবিল, বই, কাঠ, মাটি, গাছপালা ইত্যাদি নিষ্প্রভ বস্তু।

স্বপ্রভ বস্তুর আলো যখনই নিষ্প্রভ বস্তুর ওপর পড়ে, তখন নিষ্প্রভ বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, তখনই আমরা ওই নিষ্প্রভ বস্তুগুলিকে দেখতে পাই।

কোনো বস্তুর স্বপ্রভ বা নিষ্প্রভ হওয়া ওই বস্তুটির অবস্থার উপর কখনো কখনো নির্ভর করে। যেমন, সাধারণ উষ্ণতায় একখন্ড লোহা নিষ্প্রভ বস্তু। কিন্তু তাপ দিয়ে ওই লোহাখন্ডটিকে শেততপ্ত করলে তা শ্বেত আলো বিকিরণকারী স্বপ্রভ বস্তুতে পরিণত হয়। ঠান্ডা হলে পুনরায় নিষ্প্রভ বস্তুতে পরিণত হয়।

চাঁদকে একটি নিষ্প্রভ বস্তু কারণ— চাঁদের নিজস্ব কোনও আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়লে চাঁদ সেই আলো চারিদিকে বিকিরণ করে। চাঁদের ন্যায় বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি জ্যোতিষ্ক যাদের নিজস্ব কোনও আলো নেই, তারা সবাই নিষ্প্রভ বস্তু।

আলোর বিন্দু উৎস বা বিন্দু প্রভব

কোনো আলোক উৎসকে যদি জ্যামিতিক বিন্দু হিসাবে ধরা হয়, তবে তাকে আলোর বিন্দু উৎস বলে।

স্বপ্রভ বস্তুর প্রত্যেক বিন্দু থেকেই চারিদিকে আলো বিকীর্ণ হয়। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আলোক বিজ্ঞানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আলোর উৎসকে একটি জ্যামিতিক বিন্দু হিসাবে কল্পনা করা হয়, যাকে বিন্দু উৎস বা প্রভব বলে।
বাস্তবক্ষেত্রে বিন্দু উৎসের কোনও অস্থিত্ব নেই। বহুদূরে থাকার জন্য সূর্য ও নক্ষত্রগুলিকে বিন্দু উৎস হিসাবে কল্পনা করা হয়।

আলোর বিস্তৃত উৎস বা বিস্তৃত প্রভব

যেকোনো আকারের আলোর উৎস অসংখ্য বিন্দু উৎসের সমন্বয়ে গঠিত বলে ধরা হয়। নির্দিষ্ট আকারযুক্ত আলোক উৎসকে আলোক বিস্তৃত উৎস বা বিস্তৃত প্রভব বলে। দূরত্ব খুব বেশী হওয়ায় বিশাল নক্ষত্রগুলি বিন্দু উৎসের মতো, কিন্তু ছোটো মোমবাতির শিখাটি হল বিস্তৃত উৎস।

সুসংগত আলোক উৎস

যে উৎস হতে আলোক তরঙ্গসমূহ সর্বদা সমদশায় নিঃসৃত হয়, তাকে সুসংগত আলোক উৎস বলে।

আলোক মাধ্যম

আলো যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে তাকে আলোক মাধ্যম বলে।

আলো যেহেতু তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের একটি অংশ, তাই এর বিস্তারের জন্য বাস্তব মাধ্যমের প্রয়োজন নাও হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলের উপরে যে মহাশূন্য রয়েছে তার ভিতর দিয়ে সূর্য ও নক্ষত্রের আলো অবাধ গতিতে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়।

আলোক মাধ্যমের প্রকৃতি

সমসত্ব মাধ্যম (Homogeneous Medium)

যে মাধ্যমের ভৌত ধর্মগুলি সর্বত্র একই থাকে অর্থাৎ যে মাধ্যমে আলো সম গতিতে সবদিকে চলাচল করতে পারে তাকে সমসত্ব মাধ্যম বলে।
যেমন: স্বল্প পরিসরে বায়ু, জল, কাচ ইত্যাদি হল সমসত্ব মাধ্যম।

অসমসত্ব মাধ্যম (Heterogeneous Medium)

যে মাধ্যমের সমস্ত অংশের ভৌত ধর্ম একই নয় অর্থাৎ যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো সম গতিতে চলাচল করতে পারে না, বিভিন্ন অংশে আলোর গতিবেগ বিভিন্ন হয়, সেই মাধ্যমকে অসমসত্ব আলোক মাধ্যম বলে। যেমন, অভ্র, কোয়ার্জ ইত্যাদি।

একটি অসমসত্ব মাধ্যমকে একাধিক সমসত্ব মাধ্যমে ভাগ করা যেতে পারে। বায়ুমন্ডল সামগ্রিকভাবে একটি অসমসত্ব মাধ্যম। কারণ বায়ুমন্ডলের নীচের বায়ুস্তরের ঘনত্ব, উপরের বায়ুস্তরের ঘনত্বের তুলনায় বেশী।

আলোক মাধ্যমের প্রকারভেদ

আলোক মাধ্যম মূলত তিন রকমের। যথা–

1. স্বচ্ছ মাধ্যম (Transparent Medium)
2. ঈষৎস্বচ্ছ মাধ্যম (Translucent Medium)
3. অস্বচ্ছ মাধ্যম (Opaque Medium)

স্বচ্ছ মাধ্যম

যে সব মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো সহজে চলাচল করতে পারে, তাদের স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন, শূন্যস্থান, কাচ, বিশুদ্ধ জল, বায়ু ইত্যাদি হল আলোকের স্বচ্ছ মাধ্যম। এইসব মাধ্যমে আলো অতি সামান্য পরিমাণে শোষিত হয়।

ঈষৎস্বচ্ছ মাধ্যম

যে সব মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো আংশিকভাবে চলাচল করতে পারে, তাদের ঈষৎস্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন, তৈলাক্ত কাগজ, ঘষাকাচ, রঙিন কাচ ইত্যাদি এই ধরণের মাধ্যম।

অস্বচ্ছ মাধ্যম

যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো একেবারেই চলাচল করতে পারতে না, তাকে অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন, ধাতু, কাঠ, পাথর, কয়লা, মাটি ইত্যাদি।

আলোক রশ্মি

কোনো দীপ্তিমান বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে আলো যেকোনো দিকে ঋজু পথ ধরে চলে, সে পথকেই আলোক রশ্মি বলে।

অর্থাৎ আলো যে পথে মাধ্যমের একবিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যায়, সেই পথকে আলোক রশ্মি বলে।

আলোক রশ্মি হলো দৃষ্টিবিজ্ঞানে আলোক এর একটি আদর্শ মডেল। এটি প্রকৃত আলোর তরঙ্গফ্রন্ট এর বাছাই করা লম্ব বরাবর এমন একটি রেখা যা, শক্তি প্রবাহ এর দিকনির্দেশক বিন্দু নির্দেশ করে। দৃষ্টিবিজ্ঞানে আমরা মেরিডিয়োনাল বা স্পর্শক রশ্মি, স্কিউ রশ্মি, প্রান্তিক অক্ষীয় রশ্মি, প্রধান বা বি রশ্মি, ধনু বা ট্রান্সভার্স রশ্মি, প্যারাক্সিয়াল রশ্মি, প্যারাব্যাসাল রশ্মি, সসীম বা প্রকৃত রশ্মি ইত্যাদি রশ্মি সম্পর্কে জানতে পারি।

আপতিত রশ্মি

যে রশ্মি প্রতিফলকের উপর এসে পড়ে তাকে আপতিত রশ্মি বলে।

প্রতিফলিত রশ্মি

প্রতিফলকে বাধা পেয়ে যে রশ্মি আগের মাধ্যমে ফিরে আসে তাকে প্রতিফলিত রশ্মি বলে।

প্রতিসৃত রশ্মি

প্রতিসৃত রশ্মি বা সঞ্চারিত রশ্মি হলো প্রদত্ত আপতিত রশ্মি যা পৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়।

শক্তি সংরক্ষণ এর কারণে আপতিত রশ্মির শক্তি প্রতিসৃত রশ্মির শক্তি এবং পৃষ্ঠে শোষিত শক্তির সমষ্টির সমান হয়।

আলোক রশ্মিগুচ্ছ

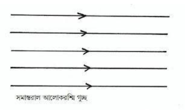
কয়েকটি আলোক রশ্মি এক সঙ্গে থেকে যে গুচ্ছ গঠন করে, তাকে আলোক রশ্মিগুচ্ছ বলে। একটি আলোক রশ্মিগুচ্ছকে অসংখ্য রশ্মির সমষ্টি হিসাবে কল্পনা করা হয়।

আলোক রশ্মিগুচ্ছের প্রকারভেদ

1. সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ (Parallel Rays)
2. অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ (Converging Rays)
3. অপসারী রশ্মিগুচ্ছ (Diverging Rays)

সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ

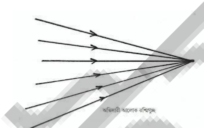
আলোক রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলো যদি পরস্পর সমান্তরাল হয়, তবে ওই রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলে।



অনেক দূর থেকে আসা কোনো আলোক উৎস থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলে ধরে নেওয়া হয়। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ হল সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ।

অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ

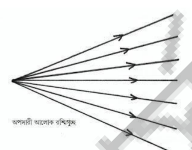
যদি কোনও আলোক রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলো আলোর গতির কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা মিলিত হতে চায়, তখন ওই রশ্মিগুচ্ছকে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে।



উত্তল লেন্সের মাধ্যম চারপাশের মাধ্যম অপেক্ষা বেশী ঘনত্বের হলে, একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ ওই লেন্স দিয়ে প্রতিসৃত হওয়ার পর অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয়।

অপসারী রশ্মিগুচ্ছ

যদি কোনও আলোর আলোক রশ্মিগুলো এমন হয় যে, তারা নির্দিষ্ট কোনও বিন্দু থেকে নির্গত হয়ে রশ্মিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় তবে ওই রশ্মিগুচ্ছকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে।



যেকোনো আলোক উৎস থেকে বিকীর্ণ আলোর রশ্মিগুলো সর্বদা অপসারী রশ্মিগুচ্ছই হয়।

প্রতিবিম্ব

কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে।

একটি বস্তু হলো অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি। ফলে বিন্দুর মতো বস্তুরও প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

প্রতিবিম্বের প্রকারভেদ

প্রতিবিম্ব দুই প্রকার। যথা—

1. বাস্তব বা সদ প্রতিবিম্ব
2. অবাস্তব বা অসদ প্রতিবিম্ব

বাস্তব প্রতিবিম্ব

কোন বিন্দু উৎস থেকে আগত আলোকরশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে যদি অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয়, তবে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। যেমন: উত্তল লেন্স দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্ব বাস্তব হয়।

অবাস্তব প্রতিবিম্ব

কোন বিন্দু উৎস থেকে আগত আলোকরশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে যদি অন্য কোন বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তবে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। যেমন: সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব অবাস্তব হয়।

বাস্তব এবং অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য

বাস্তব প্রতিবিম্ব	অবাস্তব প্রতিবিম্ব
কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরনের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরনের পরে দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে দ্বিতীয় বিন্দুতে অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোক রশ্মির প্রকৃত মিলনের ফলে বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	অবাস্তব প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না।
বাস্তব প্রতিবিম্ব চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়ও ফেলা যায়।	অবাস্তব প্রতিবিম্ব চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না।
বাস্তব প্রতিবিম্ব অবতল দর্পণ ও উত্তল লেন্সে তৈরি হয়।	অবাস্তব প্রতিবিম্ব সব রকম দর্পণ ও লেন্সে উৎপন্ন হয়।

প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতি

কোনও আলোক উৎসের আলো একটি সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে কোনও পর্দার ওপর পড়লে, পর্দায় আলোকিত অংশের আকৃতি বা গঠন, আলোক উৎসের মতো হয়। একে আলোক উৎসটির প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতি বলে।

এই পদ্ধতিতে সূচীছিদ্র ক্যামেরার সাহায্যে একটি বাতির শিখার প্রতিচ্ছবি গঠিত হয়। সূচীছিদ্র ক্যামেরায় প্রতিকৃতি উৎপন্ন হওয়ার সময় আলোকরশ্মির প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হয় না। এ জন্য সূচীছিদ্র ক্যামেরায় গঠিত প্রতিকৃতিকে প্রতিবিম্ব বলা যায় না।

ছায়া (Shadow)

কোনও আলোক উৎসের সামনে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে, ওই বস্তুটির পেছনে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানের সৃষ্টি হয়, তাকে ওই অস্বচ্ছ বস্তুর ছায়া বলে।

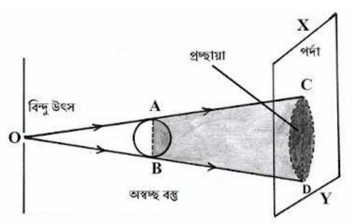
ছায়ার আকার-আকৃতির নির্ভরশীলতা

কোনো আলোক উৎসের সামনে একটি অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে যে ছায়ার সৃষ্টি হয় তার আকৃতি ও প্রকৃতি কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন—

- আলোর উৎস
- অস্বচ্ছ বস্তুর আকার
- আলোক উৎস থেকে অস্বচ্ছ বস্তুর দূরত্ব
- অস্বচ্ছ বস্তু থেকে পর্দার দূরত্ব

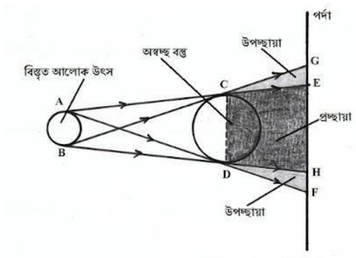
প্রচ্ছায়া (Umbra)

কোনো আলোক উৎসের সামনে অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে যে ছায়া উৎপন্ন হয় তা নির্ভর করে আলোর উৎস, পর্দার দূরত্বের ওপর। এখন অস্বচ্ছ বস্তুর পিছনে একটি পর্দা রাখলে, আলোক উৎস যদি খুব ক্ষুদ্র আকারের অর্থাৎ বিন্দু উৎস হয় তাহলে ওই অস্বচ্ছ বস্তুর পিছনে পর্দায় যে ছায়া পড়ে তা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এই ঘন কালো অঞ্চলের ছায়াকে প্রচ্ছায়া বলে। প্রচ্ছায়া অঞ্চল থেকে আলোক উৎসকে দেখা যায় না।



উপচ্ছায়া (Penumbra)

কোনো আলোক উৎসের সামনে অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে যে ছায়া উৎপন্ন হয় তা নির্ভর করে আলোর উৎস, পর্দার দূরত্বের ওপর। এখন অস্বচ্ছ বস্তুর পিছনে একটি পর্দা রাখলে, আলোক উৎস যদি বিস্তৃত বা বড়ো আকারের হয় তখন এই প্রচ্ছায়া বা গাঢ় অন্ধকার অংশের চারিপাশে অপেক্ষাকৃত কম অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। একে উপচ্ছায়া বলে। বিন্দু আলোক উৎসের ক্ষেত্রে প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া একই হয়। এই উপচ্ছায়া অঞ্চল থেকে আলোক উৎসের কিছু অংশ দেখা যায়।



প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া সংক্রান্ত কিছু তথ্য

- উপচ্ছায়া সাধারণত বিস্তৃত আলোক উৎসের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়।
- বিন্দু আলোক উৎসের ক্ষেত্রে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া একই হয়।
- বস্তু ও পর্দার মধ্যে ব্যবধান কমতে থাকলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার ব্যবধানও কমতে থাকে।
- বস্তু ও পর্দার মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার ব্যবধানও বাড়তে থাকে।
- বিন্দু উৎস ও বস্তুর মধ্যে দূরত্ব কমালে ছায়া বড়ো হতে থাকে।
- বিন্দু উৎস ও বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়ালে ছায়া ছোটো হতে থাকে।
- আলো সরলরেখায় গমন করে বলেই ছায়া গঠিত হয়।
- উপচ্ছায়া কেবলমাত্র বিস্তৃত আলোক উৎসের ক্ষেত্রেই গঠিত হয়। আসলে, উপচ্ছায়া অংশে আলোক উৎসের কিছু অংশ থেকে আলো প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তাই সেখানে অন্ধকার গাঢ় হতে পারে না।

উষা ও গোধূলি

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষন আগে এবং সূর্যাস্তের পরেও ভূ-পৃষ্ঠ কিছুক্ষণ অল্প আলোকিত থাকে। একেই উষা ও গোধূলি বলে।

আসলে সূর্যোদয়ের আগে, সূর্যের রশ্মি আমাদের কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু ধূলিকণাগুলি উপরে থাকায় ওদের ওপর সূর্যরশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় এবং সেই বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে যায় ও ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। একে উষা বলে।

অনুরূপে সূর্যাস্তের পরও, সূর্যের রশ্মি আমাদের কাছে সরাসরি পৌঁছায় না। কিন্তু ওপরের বায়ুমন্ডলের ধূলিকণাগুলি দ্বারা ওই সূর্যরশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় এবং সেই বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। তাই সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ ভূ-পৃষ্ঠ আলোকিত থাকে। একে গোধূলি বলে।

ক্রিস্টাল বা স্ফটিক বা কেলাস

যে সব কঠিন পদার্থ ক্ষুদ্রাকার ও সমসত্ব, যাদের পৃষ্ঠদেশ সমতল ও মসৃণ এবং পৃষ্ঠদেশগুলো একে অপরের সাথে সরল রেখায় মিলিত হয়ে সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি গঠন করে (যে আকৃতি প্রস্তুতির সময় স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে) তাদেরকে কেলাস বা স্ফটিক বলা হয়।

ক্রিস্টাল বা স্ফটিক কঠিন পদার্থের একটি বিশেষ রূপ। যে সকল কঠিন পদার্থের কণাগুলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত থাকে, তাদেরকে দানাদার পদার্থ বলা হয়। এই জাতীয় পদার্থের অণুগুলো একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক রূপ লাভ করে। এই জাতীয় পদার্থকে সাধারণভাবে স্ফটিক বা কেলাসাকার পদার্থ বলা হয়।

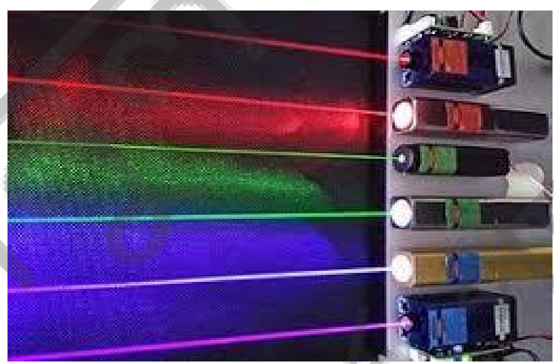
গঠন প্রকৃতি অনুসারে কঠিন পদার্থ দুই প্রকার। যথা—

1. কেলাস বা দানাদার প্রকৃতির
2. দানাদার নয় এমন প্রকৃতির কঠিন বস্তু।

আমরা খাদ্য লবণ ও চিনি প্রায় প্রতিদিনই ব্যবহার করি। এই পদার্থগুলি দানাদার। এছাড়া ফিটকিরি, তুতে, ইউরিয়া সার এই পদার্থগুলিও দানাদার। চুন, পানি এ দুটি বস্তু দানাদার নয়। দানাদার বস্তুসমূহের নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি এবং সমতল ও মসৃণ পৃষ্ঠদেশ আছে, যেগুলো একটি অপরটির সাথে সরল রেখায় মিলিত হয়। এ ধরনের দানাদার বস্তুকেই স্ফটিক বা কেলাস বলা হয়।

কোন একটি নির্দিষ্ট পদার্থের সব স্ফটিকের আকৃতি সবসময়ই এক হবে তবে আকার ছোট-বড় বা ভিন্ন হতে পারে। কোন স্ফটিক পদার্থের আকৃতি পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়বহন করে। NaCl এর কেলাস ঘনক (Cubic) আকৃতির, ফিটকিরি অষ্টতলকীয় (Octahedral) আর সালফারের সবচেয়ে স্থায়ী রুপ মনোক্লিনিক (Monoclinic) আকৃতির। কোন পদার্থের কেলাস আকৃতি পদার্থটিকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে। যখন দুই বা ততোধিক পদার্থের কেলাস আকৃতি একই ধরনের হয়, তখন পদার্থগুলিকে পরস্পরের সমরূপী বলা হয় এবং এই বিষয়টিকে সমরূপতা (isomerism) বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) এই দু'টি পদার্থের স্ফটিকের গঠনই ঘনক আকৃতির। তাই এরা পরস্পরের সমরূপী। গ্রীন ভিট্রিয়ল ($FeSO4.7H2O$), হোয়াইট ভিট্রিয়াল ($ZnSO4.7H2O$) এবং ইপসম লবণ ($MgSO4.7H2O$) এই তিনটি পদার্থও পরস্পরের সমরূপী। তাই এদের কেলাসের গঠন প্রকৃতি একই রকম।

লেজার রশ্মি



দৃশ্যমান আলোর একটি পরিবর্তিত শক্তিশালী রূপ হলো লেজার (Laser)। ১৯৬০ সালে লেজার উদ্ভাবনের পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সব শাখায় লেজার ব্যবহার করা হচ্ছে।

লেজার একটি আক্ষরিক নাম। এটি 'লাইট অ্যামপ্লিফিকেশান বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইংরেজি অক্ষর LASER এর L হল Light, A হল Amplification, S হল Stimulated, E হল Emission, R হল Radiation; অর্থাৎ LASER এর পূর্ণ রূপ হলো Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. অর্থাৎ উত্তেজিত বিকিরণের সাহায্যে আলোক বিবর্ধন। বিশেষ উদ্দীপনায় আলোর বিকিরণ ঘটিয়ে সাধারণ আলোর ক্ষমতা ও শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলে লেজার তৈরি করা হয়।

কোন বিশেষ পরমাণুকে ফোটন কণিকা দ্বারা উত্তেজিত করে লেজার রশ্মি তৈরী করা হয়। এ রশ্মি অত্যধিক লক্ষ্যভেদি, সুসঙ্গত, একক রঙের এবং তীব্র শক্তিসম্পন্ন একগুচ্ছ আলো। বিশেষায়িত লেজার যন্ত্র থেকে লেজার রশ্মি একমুখী আলো রুপে নিঃসৃত হয় এবং কোনো রকম বিচ্যুতি ছাড়াই বহুদূর যেতে পারে।

লেজার যন্ত্রের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গকে কোন ক্রিস্টাল বা স্ফটিকের মধ্য দিয়ে চালনা করা হলে উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে এবং অতি শক্তিশালী সংসক্ত সুসংগত আলোক রশ্মি নিঃসরিত হয়। এই রশ্মির নাম লেজার রশ্মি।

এটি এর যাত্রা পথে সাধারণ আলোর মতো ছড়িয়ে যায়না। একই বর্ণের আলোতে একই মাপের তরঙ্গ থাকলেও তারা বিভিন্ন তলে চলে। কিন্তু লেজারে সব তরঙ্গই হয় একই মাপের এবং তারা চলে একই তলে অর্থাৎ লেজার রশ্মি সংসক্ত। এ রশ্মি অত্যন্ত ঘন সংবদ্ধ একমুখী বলে তা অনেক পথ অতিক্রম করতে পারে এবং এরা মাত্র কয়েক মাইক্রন (১ মাইক্রন = $১০^{-৩}$ মি. মি.) চওড়া। এজন্য এতে প্রচণ্ড তাপশক্তি সঞ্চার করা সম্ভব হয় এবং তাপমাত্রা সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও বেশি হয়। ফলে লেজার রশ্মি দিয়ে মানুষের একটা চুলকেও ছিদ্র করা সম্ভব।

লেজার রশ্মির আবিষ্কার

লেজার তৈরির প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে। তিনি 'অন দি কোয়ান্টাম থিওরি অব রেডিয়েশন' গবেষণাপত্রে ফোটনের ধর্ম কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, যদি কোনো ফোটন কোনো পরমাণুর ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়, তবে ইলেকট্রনটি ফোটনের শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত হবে। উত্তেজিত হয়ে ইলেকট্রনটি তাঁর মূল শক্তিস্তর থেকে উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যাবে। কিন্তু যদি ফোটন কোন উচ্চ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়, তখন উচ্চ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন তার অতিরিক্ত শক্তি ত্যাগ করে নিজের মূল শক্তিস্তরে ফিরে আসবে। এই শক্তিস্তর পরিবর্তনের সময় যে শক্তি ত্যাগ করবে, সেই শক্তি যে ফোটনটি ধাক্কা দিয়েছিল সেই ফোটনের শক্তির সমান। এক্ষেত্রে একই শক্তির দুটি ফোটন একই দিকে একইভাবে ছুটে যাবে। এই দুটি ফোটন যদি আবার দুটি উত্তেজিত ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়, আরো দুটি সমান শক্তির ফোটন পাওয়া যাবে। মোট ফোটন হবে চারটি। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এই চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলটি, ষোলটি থেকে বত্রিশটি– এভাবে কোটি কোটি একই শক্তির ফোটনের স্রোত তৈরি হবে। এই ফোটনগুলির প্রত্যেকটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান। ফলে এদের সম্মিলিত প্রাবল্য হবে সাধারণ আলোর চেয়ে অনেক বেশি।

আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে প্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী চার্লস হার্ড টাউনস। তিনি ১৯৫৩ সালে অ্যামোনিয়া বাষ্পের ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে সেখান থেকে শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ তৈরি করেছিলেন, যেটার নাম দেয়া হয়েছিল **মেজার** (Maser – মাইক্রোওয়েভ অ্যাম্প্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অ্যান্ড রেডিয়েশন)। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। মেজার পদ্ধতিতে যে শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ পাওয়া যায়– সেই মাইক্রোওয়েভ খালি চোখে দেখা যায় না। মেজার পদ্ধতির মতো করে ১৯৬০ সালে মাইক্রোওয়েভের পরিবর্তে শক্তিশালী দৃশ্যমান আলো তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী থিওডর হ্যারোল্ড ম্যাইম্যান।



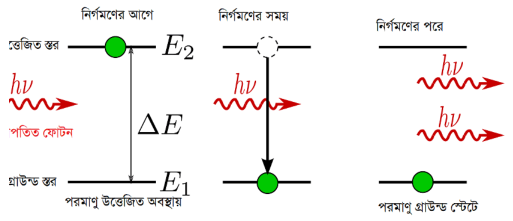
বিশ্বের প্রথম লেজারের সাথে থিওডর ম্যাইম্যান

শুরুতে এর নাম ছিল অপটিক্যাল মেজার। পরে নাম দেয়া হয় লেজার। থিওডর ম্যাইম্যান লেজারের উৎস হিসেবে একটি রুবী রড (রুবী পাথরের রড) ব্যবহার করেন। রুবী রডে উচ্চশক্তির আলো ফেলে রুবীর পরমাণুর ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে সেই ইলেকট্রন থেকে ফোটনের স্রোত তৈরি করেন। সেই ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৯৪ ন্যানোমিটার যা দৃশ্যমান আলোর লাল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি। ম্যাইম্যানের দেখানো পথে এখন বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেজার রশ্মি তৈরি করা সম্ভব। যে উৎস থেকে লেজার তৈরি হয়– সেই উৎসের নামেই লেজার রশ্মির নাম দেয়া হয়। যেমন রুবী থেকে উৎপন্ন লেজার– রুবী লেজার, আর্গন গ্যাস থেকে উৎপন্ন লেজার– আর্গন লেজার, ইত্যাদি।

লেজার উৎপাদনের মূলনীতি

লেজার উৎপাদনের মূলনীতি হলো পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম মেকানিকসের নীতি। পরমাণুর ভেতর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারপাশে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মে এগুলি কক্ষপথে বিন্যস্ত থাকে– প্রথম কক্ষপথে ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে ৮টি, তৃতীয় কক্ষপথে ১৮টি ইত্যাদি। ইলেকট্রনের কক্ষপথগুলি হলো তাদের শক্তিস্তর। একটি কক্ষপথে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে সবগুলি ইলেকট্রনের শক্তি সমান। নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের যে কক্ষপথ (১ম কক্ষপথ), সেই কক্ষপথে যে সব ইলেকট্রন থাকে তাদের শক্তি সবচেয়ে কম। এই শক্তিস্তরকে গ্রাউন্ড স্টেট বলা হয়। ইলেকট্রনগুলি যদি কোনভাবে শক্তি শোষণ করে তখন তারা উত্তেজিত হয়ে নিজেদের শক্তিস্তর থেকে উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। কিন্তু একটু পরেই সেই অতিরিক্ত শক্তি ত্যাগ করে নিজের শক্তিস্তরে ফিরে আসে। স্বতস্ফূর্তভাবে শক্তি নির্গমনের এই প্রক্রিয়াকে স্পনটেনিয়াস এমিশন বলা হয়। পরমাণুর ইলেকট্রনগুলিকে যদি নির্দিষ্ট শক্তির ফোটনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটানো যায়, তাহলে ফোটনের শক্তি শোষণ করে ইলেকট্রনগুলি উত্তেজিত হয়ে উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। তারপর যখন নিজের শক্তিস্তরে ফিরে আসে তখন যে শক্তি শোষণ করেছিল তা ফোটনের মাধ্যমে বের করে দেয়। এই নির্গত ফোটনের শক্তি শোষিত ফোটনের শক্তির সমান। ফোটনের প্রবাহ যদি অনবরত চলতে থাকে– তাহলে একটি ফোটন থেকে একই শক্তির ২টি ফোটন, ২টি থেকে ৪টি, ৪টি থেকে ৮টি ফোটন– এভাবে সেকেন্ডের মধ্যে কোটি কোটি ফোটনের প্রবাহ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ফোটনের শক্তি সমান এবং প্রত্যেকেই একই সাথে একই দিকে যায়। তীব্র প্রাবল্যের এই ফোটন প্রবাহ'ই লেজার।

সাধারণ দৃশ্যমান আলোতে ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে কোন তরঙ্গ থাকতে পারে। তাই আলোকরশ্মি সমশক্তির হয় না এবং বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মিশ্রণের কারণে সবগুলি ফোটন একদিকে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লেজারে সবগুলি ফোটনের শক্তি সমান, ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যও সমান। ফলে তারা সব এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত থাকে। লেজার রশ্মি তাই একটুও না ছড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পৃথিবী থেকে চাঁদের পৃষ্ঠে লেজার রশ্মি পাঠানো হয়, সেই রশ্মি একটুও ছড়িয়ে না পড়ে চাঁদের পিঠে রাখা আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে।



$$E_2 - E_1 = \Delta E = h\nu$$

একটি ফোটন থেকে দুইটি একই শক্তির ফোটন সৃষ্টির প্রক্রিয়া

বিভিন্ন প্রকারের লেজারেরই মূল প্রস্তুত প্রণালী কমবেশি একই রকম। প্রথমে দরকার একটি উপযুক্ত পদার্থের অ্যামপ্লিফাইয়িং মিডিয়াম বা গেইন মিডিয়াম বা অ্যাকটিভ মিডিয়াম। এই মিডিয়ামের ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে ফোটন বের করা হয়। এই মিডিয়াম কঠিন, গ্যাস, সেমিকন্ডাক্টর ইত্যাদি হতে পারে। এই পদার্থের ওপর বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করলে পদার্থের ইলেকট্রন উত্তেজিত হয় এবং ফোটন নির্গত হয়। অ্যাকটিভ মিডিয়ামের আলোর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিডিয়ামের চারপাশে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হয়, অথবা অন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় পাম্পিং। ফ্ল্যাশ লাইট বা অন্য লেজার দিয়েও এই পাম্পিং করা যায়। পাম্পিংসহ অ্যাকটিভ মিডিয়ামকে একটি সিলিন্ডার আকৃতির নলের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এই নলটিকে বলা হয় লেজার ক্যাভিটি। এই নলের দুই প্রান্তে দুটি আয়না বসানো থাকে। নলের ভেতর যে আলো উৎপন্ন হয় সেই আলো এই আয়না দুটোতে অনবরত প্রতিফলিত হতে থাকে। একটি আয়না নলের ভেতরের সব আলোর প্রতিফলন ঘটায়। অন্যদিকের আয়নাটি পুরোপুরি প্রতিফলক নয়। সেই আয়না কিছুটা স্বচ্ছ– যার ভেতর দিয়ে লেজার রশ্মি বের হয়ে আসে।



লেজার তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান

লেজারের প্রকারভেদ

সাধারণত অ্যাকটিভ মিডিয়ামের নাম অনুসারে লেজারের নাম হয়ে থাকে। যেমন অ্যাকটিভ মিডিয়াম রুবি হলে– রুবি লেজার, গেইন মিডিয়াম আর্গন গ্যাস হলে আর্গন লেজার ইত্যাদি। বিভিন্ন মিডিয়াম থেকে উৎপন্ন লেজারের শক্তি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উৎপত্তির দিক থেকে বিবেচনা করলে লেজারকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. রুবী লেজার (এটি সর্বপ্রথম উৎপন্ন লেজার যা রুবী কেলাস ব্যবহার করে উৎপন্ন করা হয়েছিলো।
2. হিলিয়াম-নিয়ন গ্যাস লেজার
3. কার্বন ডাই অক্সাইড লেজার
4. অর্ধপরিবাহী লেজার
5. রাসায়নিক লেজার

লেজার রশ্মির ধর্ম

লেজার উৎপন্নকারী যন্ত্র এমন আলোক বীম (লেজার রশ্মি) তৈরী করে যার কিছু ধর্ম হলো—

- এর আলো হয় সংসক্ত (যখন সকল তরঙ্গ সমান দশায় থাকে)।
- লেজারের আলো প্রায় একবর্ণী।
- লেজার বীমের অপসারীতা নেই বললেই চলে।
- লেজার বীম অত্যান্ত তীব্র। সাধারণ আলোর এরুপ তীব্রতা আনতে ১০৩০ কেলভিন তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

লেজার রশ্মির ব্যবহার

লেজার এখন ব্যবহৃত হচ্ছে যে কোন আধুনিক প্রযুক্তিতে। স্লাইড পয়েন্টারের লেজার রশ্মি তৈরি করা হচ্ছে কলমের চেয়ে ছোট ডিভাইসে। যে কোন বারকোডের ডিজিটাল স্ক্যানিং-এ লেজার স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজার দিয়ে বড় বড় স্টিলের পাত কেটে ফেলা যায় নিমিষে। কাটা, ঝালাই, ড্রিলিং বা খনন, উপগ্রহ ট্র্যাকিং, কম্প্যাক্ট ডিস্ক ও বারকোড গঠন, সার্জারি, চিকিৎসা ও গবেষণা সহ আরো অনেক ক্ষেত্রে লেজার বহুল ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি। লেজার বীম ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে ধাতু জোড়া লাগানো যায়। লেজার বীম ওয়েল্ডিং (এল.বি.ডাব্লিউ) হলো ওয়েল্ডিং এর একটি কৌশল যার মাধ্যমে একাধিক ধাতুর টুকরো জোড়া লাগানো যায়। বীমটি একটি নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার উৎস হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে সূক্ষ্ম ও গভীর ওয়েল্ডিং করা যায়।

লেজারের সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারকরণ কাজে। উদাহরণস্বরুপ সিডি (কমপ্যাক্ট ডিস্ক) রাইটার -এর মাধ্যমে সিডি-তে (আলোক সংবেদনশীল রং সম্পন্ন একটি ডিস্ক) ডাটা লিখতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন লেজার ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রিন্টারেও লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক সিডি প্লেয়ার এবং সিডি রম ৭৮০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অল্প কয়েক মিলি-ওয়াট সম্পন্ন নিঃসরণশীল স্বল্প ক্ষমতার ডায়োড লেজার ব্যবহার করে। ডিভিডি (ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক) অপেক্ষাকৃত স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে নিঃসরণশীল এমন লেজার ব্যবহার করে, যা এমনকি উচ্চতর ঘনত্বেও তথ্যকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ।

নির্মাণ ও পূর্তকর্ম সংক্রান্ত প্রয়োগে ভূমি বা পানির উপর তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, নিখুঁতভাবে সরলরেখাকে সীমা নির্দেশ করার প্রয়োজনে লেজার লাইন জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। দৃশ্যমান ডায়োড লেজারকে কাজে লাগিয়ে অপটিক্যাল বার কোড পাঠ করা যায়। উৎপন্ন দ্রব্য, বইপত্র, পার্সেল প্রভৃতির গায়ে ছাপানো বার কোড দ্রুত পড়ার ক্ষেত্রে এবং ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরগুলিতে, বইয়ের দোকানে, ডাকবিভাগে লেজার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

অপটিক্যাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি পাতলা সিলিকা অপটিক্যাল ফাইবারের ভিতর একটি মড্যুলেটেড লেজার বীমকে দীর্ঘ দূরত্বের মধ্যে তথ্য (ভয়েস, ফ্যাক্স, ভিডিও বা কম্পিউটার তথ্য বা ডাটা) প্রেরণ করতে ব্যবহার করা হয়। প্রতি অপটিক্যাল ফাইবারে তথ্য প্রেরণ হার প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার মেগাবাইট। বেতার তরঙ্গ অপেক্ষা একটি লেজার বীম অনেক বেশি তথ্য বহন করতে পারে বলে এই প্রযুক্তি যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন করতে পারে।

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় লেজার প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহূত হয়। পদার্থবিজ্ঞানে হিলিয়াম-নিওন লেজারের একত্রিত আলোকরশ্মি গুচ্ছকে (coherent beams) ব্যবহার করা যেতে পারে একটি বস্তুর সত্যিকারের ত্রিমাত্রিক ছবি (হলোগ্রাম হিসেবে পরিচিত) নিতে। পরবর্তীতে লেজারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তুকে পুনঃসৃষ্টি করতে হলোগ্রামকে আলোকিত করা হতে পারে। লেজার লাইট শো বর্তমানে বিনোদনের বেশ জনপ্রিয় উৎস। এছাড়া রুপচর্চায় বর্তমানে লেজার ট্রিটমেন্ট বেশ জনপ্রিয়।

লেজার প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে এ পদ্ধতির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে ইস্পাতের সুকঠিন স্তর কর্তন কিংবা সুক্ষ্ম কোন স্নায়ু অপারেশনসহ বহু দুঃসাধ্য কাজ লেজার রশ্মির দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৮ সালে চার্লস টাউনস এবং আর্থার লিওনার্ড শলো নামের দুই বিজ্ঞানী লেজারের ধারণাটির সূত্রপাত ঘটান। ১৯৬০ সালে থিওডর ম্যাইম্যান প্রথম অপারেশন লেজার (রুবী লেজার) তৈরি করেন। লেজার প্রযুক্তি প্রথম থেকে ব্যবহার করা হয়েছে শল্য চিকিৎসা ও চক্ষুরোগ চিকিৎসায়। আর্গন লেজার দ্বারা উৎপাদিত উষ্চ ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যেতে পারে চোখের রেটিনা পুনঃসংযুক্ত করা বা এর ধমনী বা শিরাগুলোর রেটিনোপ্যাথি চিকিৎসায়।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো লেজার সার্জারি। ১৯৬০ সালে এ চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার হওয়ার দুই বছর পর ১৯৬২ সালে সর্ব প্রথম মানব দেহে লেজার প্রয়োগ করা হয়। চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়নের ফলে মানুষ এখন কাটা-ছেঁড়াহীন পদ্ধতিতে অপারেশন বা চিকিৎসা পেতে পারে ও দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারে।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক রকমের ও শক্তির লেজার ব্যবহার করা হয়। কসমেটিক সার্জারি, ত্বকের চিকিৎসায়, ক্ষতস্থান নিরাময়ে, অসাড় স্নায়ুর উদ্দীপনা জোগাতে, দাঁতের চিকিৎসায়, চোখের চিকিৎসায়– ভিন্ন ভিন্ন রকমের লেজার রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। কী ধরনের লেজার প্রয়োগ করা হবে তা নির্ভর করে শরীরের সাথে লেজারের কী ধরনের ইন্টার‍্যাকশান বা মিথস্ক্রিয়া ঘটানো দরকার তার ওপর।

চিকিৎসার জন্য মানুষের শরীরে যে লেজার প্রয়োগ করা হয়, শরীরের কোষের সাথে তার চার ধরনের মিথস্ক্রিয়া হতে পারে– ফটোমেকানিক্যাল, ফটোথার্মাল, ফটোকেমিক্যাল, এবং ফটোবায়োস্টিমুলেশান। ফটোমেকানিক্যাল ইন্টারঅ্যাকশানে প্রচণ্ড শক্তির লেজার প্রয়োগের ফলে কোষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। চোখের কর্নিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে চোখের দৃষ্টির সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এধরনের লেজার ব্যবহার করা হয়। মূত্রথলির পাথর অপসারণেও এধরনের লেজার ব্যবহার করা হয়। লেজার দিয়ে পাথরগুলি ভেঙে ফেলা হয়। ফটোথার্মাল ইন্টারঅ্যাকশানে লেজারের শক্তি শোষণ করে কোষ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড তাপে কোষের ভেতরের জলীয় অংশ বাষ্প হয়ে যায়, ফলে কোষ মরে যায়। ফটোকেমিক্যাল ইন্টারঅ্যাকশানে শরীরের উপর রাসায়নিক প্রয়োগ করে তার ওপর লেজার প্রয়োগ করা হয়। লেজার রশ্মি রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া ঘটায়। ফটোবায়োস্টিমুলেশান কোষের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায়।

লেজার সার্জারি

লেজার সার্জারিতে যখন শরীরে লেজার প্রয়োগ করা হয় তখন রক্ত, কোষ, পেশী ইত্যাদি লেজারের শক্তি শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তখন সেই জায়গার কোষের স্বাভাবিক রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যায়। প্রচণ্ড তাপে অনেকটা সিদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হয় তাদের। তাপের ফলে কোষের প্রোটিনসহ অন্যান্য জৈব উপাদান পুড়ে যায়। লেজার যেহেতু খুব সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রয়োগ করা হয়, এই তাপ শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে না। ত্বকের ক্ষতিকর টিউমার বা অন্যান্য অনাকাঙ্খিত কোষ ধ্বংস করার জন্য সেই নির্দিষ্ট জায়গায় লেজার প্রয়োগ করা হলে খুবই কম সময়ের মধ্যে সেই কোষগুলি পুড়ে যায় এবং তাদেরকে সহজে সরিয়ে নেয়া যায়। চোখের কিছু কিছু সমস্যার সমাধানও এভাবে করা হয়, বিশেষ করে ডায়াবেটিসের কারণে চোখের রেটিনায় সমস্যা হলে সেখানে লেজারের সাহায্যে মাইক্রোসার্জারি করা যায়। লেজার সার্জারির সবচেয়ে ভালো দিক হলো এতে রক্ত বের হয় না। সার্জারির সময় রক্তনালী কেটে গেলে তাপের ফলে রক্তনালীর দেয়ালে প্রোটিন সংকুচিত হয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়। রক্তক্ষরণ খুব কম হয় বলে সার্জারি সহজতর হয়।

আরো উচ্চক্ষমতার লেজার প্রয়োগ করে শরীরের যে জায়গায় চিকিৎসা করা দরকার, সেই জায়গায় কোষকে একেবারে বাষ্প করে ফেলা যায়। উচ্চক্ষমতার লেজার ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় কোষের ভেতরের সমস্ত জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত করে ফেলে প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে। অনেক সময় সার্জারির সুবিধার্থে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমেও নির্দিষ্ট স্থানে লেজার প্রয়োগ করা হয়।

ত্বকের চিকিৎসায় লেজার

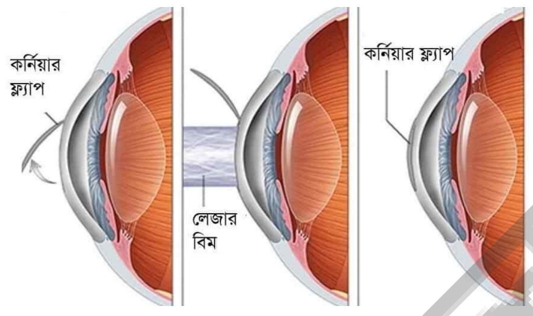
লেজার সার্জারির মাধ্যমে ত্বকের উপরিস্তরের অনেক ধরনের চিকিৎসা করা হয়। লেজারের সাহায্যে ত্বকের কসমেটিক সার্জারি করে ত্বকের অনাকাঙ্খিত দাগ, লোম, বলিরেখা ইত্যাদি দূর করা হয়। ত্বকের একেবারে বাইরের স্তর (০.১ মিলিমিটার পুরু) ফেলে দিয়ে ত্বকের দাগ দূর করা যায়। ত্বকের ক্যান্সার টিউমার দূর করতে লেজার সার্জারি খুবই কার্যকর।

চোখের চিকিৎসায় লেজার

খুব নির্দিষ্টভাবে খুবই ছোট জায়গায় প্রয়োগ করা যায় বলে চোখের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানে লেজার প্রয়োগ করা হচ্ছে। চোখের মধ্যে লেজার সরাসরিও প্রয়োগ করা যায়, আবার এন্ডোস্কোপির সাহায্যে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমেও প্রয়োগ করা যায়। স্বাভাবিক দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গের লেজার রশ্মি চোখে প্রবেশ করলে চোখের মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় না। কারণ আমাদের চোখ দৃশ্যমান আলোয় অভ্যস্ত। এই আলো চোখের কর্নিয়া ও লেন্স ভেদ করে রেটিনায় গিয়ে পৌঁছায়। লেজারও সাধারণ আলোর মতো কর্নিয়া ও লেন্সের ভেতর দিয়ে চোখের ভেতর প্রবেশ করে। রেটিনায় পৌঁছার পর সেই লেজারের শক্তি রেটিনা শোষণ করে নেয়। তাই রেটিনার সমস্যার সমাধানে লেজার প্রয়োগ করতে হলে সরাসরি চোখের ভেতর দিয়ে লেজার রশ্মি পাঠানো যায়। অতিবেগুনি লেজার রশ্মি দিয়ে চোখের কর্নিয়া ও লেন্সের চিকিৎসা করা যায়– কারণ লেন্স ও কর্নিয়া অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।

চোখের গঠন দেখলে আমরা বুঝতে পারব, যে এটা গোলাকার ছোট্ট বলের মতো– যাকে আমরা অক্ষিগোলক বলে থাকি। এর ভেতর তরল পদার্থ থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট চাপ বজায় রাখতে হয় সুস্থ চোখের জন্য। অনেক কারণে চোখের ভেতরের প্রেসার বা চাপ বেড়ে যেতে পারে। চাপ বেড়ে গেলে চোখে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত চাপে চোখের স্নায়ু ছিঁড়ে গিয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সমস্যাকে ডাক্তারি ভাষায় গ্লুকোমা (glaucoma) বলে। লেজারের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। চোখে আর্গন লেজার প্রয়োগ করে চোখের ড্রেনেজ সিস্টেমে অথবা চোখের মণিতে (iris) সূক্ষ্ম ছিদ্র করে কিছু তরল বের করে অক্ষিগোলকের চাপ কমিয়ে দেয়া হয়। চোখের ভেতর টিউমার হলে লেজার সার্জারির মাধ্যমে সেই টিউমার দূর করা যায়। অনেক সময় মাথায় আঘাত পেলে চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রেটিনায় ক্ষত তৈরি হতে পারে। লেজারের সাহায্যে এই ক্ষত জুড়ে দেয়া যায়।

ডায়াবেটিক রোগীদের চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অত্যধিক ব্লাড সুগারের কারণে রোগীর রেটিনার রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাক্তারি ভাষায় এর নাম ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। রক্তনালীর সমস্যায় রেটিনার কোষে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। আমাদের শরীর নিজে নিজে অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলে। রেটিনার কোষে রক্তচলাচল ঠিক রাখার জন্য সেখানে নতুন রক্তনালী তৈরি হয়। কিন্তু কম জায়গায় বেশি রক্তনালী হয়ে গিয়ে নতুন সমস্যা তৈরি করে। আস্তে আস্তে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে রোগীর এই সমস্যা তত মারাত্মক হয় না, কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে রোগীর চোখের সমস্যা বাড়তে থাকে। তখন লেজার সার্জারি করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়।



ল্যাসিকের বিভিন্ন ধাপ

চোখের ছানি পড়া (cataract) বয়স্ক মানুষের চোখের একটি স্বাভাবিক সমস্যা। চোখের লেন্স স্বচ্ছতা হারিয়ে ক্রমশ ঘোলা হতে থাকলে দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়। প্রচলিত চিকিৎসা হলো চোখের ছানি কাটা– বা সার্জারি করে চোখের ঘোলাটে লেন্স ফেলে দিয়ে একটা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেয়া। এতে রোগী নতুন দৃষ্টি পায়। কিন্তু অনেক রোগীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়। নতুন লেন্সের চারপাশে ময়লা আবরণ জমে নতুন লেন্সও ঘোলা হতে থাকে। সেক্ষেত্রে লেজার দিয়ে সেই ময়লা আবরণ বাষ্পীভূত করে ফেলা যায়।

চোখের হ্রস্বদৃষ্টি (myopia) হলে আমরা সাধারণত মাইনাস পাওয়ারের চশমা পরে কাজ চালিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায় লেজারের মাধ্যমে। এই সমস্যা হয় মূলত কর্নিয়া যদি সঠিক কোণে আলোর প্রতিসরণ ঘটাতে না পারে। তখন চোখের লেন্সে আলো সঠিক কোণে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে রেটিনায় প্রতিবিম্ব তৈরি হয় না। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য লেজারের সাহায্যে কর্নিয়ার আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয়, যাতে কর্নিয়ার ভেতর দিয়ে আলো যাবার সময় সঠিকভাবে প্রতিসৃত হয়ে চোখের লেন্সে ঢোকে। এই পদ্ধতির নাম ফটোরিফ্রাকটিভ কেরাটেকটোমি (photorefractive keratectomy)। এই পদ্ধতির আরো আধুনিকায়ন ঘটেছে নতুন একটি পদ্ধতিতে যার নাম ল্যাসিক (LASIK – laser assisted in-situ keratomileusis)। এই পদ্ধতিতে প্রথমে কর্নিয়ার ওপরের অংশ কেটে আলাদা করে রাখা হয়। তারপর সেখানে আল্ট্রাভায়োলেট লেজার প্রয়োগ করে প্রয়োজন মতো কর্নিয়ার আকৃতির পরিবর্তন করা হয়। তারপর কর্নিয়ার ওপরের অংশ যেটা আলাদা করে রাখা হয়েছিল সেটা আবার বসিয়ে দেয়া হয়। রোগী কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীকে আর চশমা পরতে হয় না। তবে কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে ল্যাসিক অপারেশানের কয়েক বছর পর আবার চশমা পরতে হতে পারে।

দাঁতের চিকিৎসায় লেজার

মুখের ও চোয়ালের নরম ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিকর কোষ অপসারণ করার জন্য লেজার ব্যবহৃত হচ্ছে। দাঁতের চিকিৎসার জন্য দাঁতের আকৃতির পরিবর্তন, কিংবা দাঁতের মাঝখানে গর্ত করার জন্যও লেজার ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সময়ও কম লাগে, আবার রোগীর অস্বস্তি এবং কষ্টও কম হয়। দাঁতের ফিলিং এবং রুট ক্যানেল করার জন্যও লেজার ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক্যান্সার চিকিৎসায় লেজার

ত্বকের ক্যান্সার টিউমার অপারেশানে লেজার রশ্মি এখন খুবই কার্যকরী। ত্বকের ওপরের স্তর থেকে দুই মিলিমিটার গভীর পর্যন্ত টিউমারের ওপর লেজার প্রয়োগ করে টিউমারের সব কোষ মেরে ফেলা যায়। ক্যান্সার চিকিৎসায় আরেকটি কার্যকর পদ্ধতি ফটোডায়নামিক থেরাপিতেও লেজার ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে রোগীর শরীরে আলোক-সংবেদী রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়। শরীরের ক্যান্সার কোষ এই রাসায়নিক শোষণ করে। তারপর সেখানে লেজার প্রয়োগ করলে এই কোষগুলির শোষিত রাসায়নিক কার্যকর হয়ে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে ফেলে। যেসব ক্যান্সার কোষ রেডিওথেরাপি কিংবা কেমোথেরাপি দিয়ে ধ্বংস করা সম্ভব হয় না, তাদের কোন কোনটার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

লেজার রশ্মি একদিকে যেমন চিকিৎসার মাধ্যম হিসেবে জীবন বাঁচাতে পারে, তেমনি আবার অদক্ষদের হাতে পড়লে প্রচন্ড ক্ষতির কারণও হতে পারে।

খরা, বৃষ্টি ও বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণে লেজার

লেজার রশ্মি ব্যবহার করে নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন স্থানে খরা এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত নামানোর চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা জোরালোভাবে মনে করছেন, লেজারের মাধ্যমে মেঘ থেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত ঘটানো সম্ভব হবে। সেন্ট্রাল ফোরিডা কলেজ অব অপটিকস অ্যান্ড ফটোনিকস এবং ইউনিভার্সিটি অব এরিজোনার বিজ্ঞানীরা উচ্চশক্তির লেজার রশ্মিকে কোনো মেঘের মধ্যে নিক্ষেপ করে বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাত ঘটানোর লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে কাজ করছেন। কোনো একটি লেজার রশ্মিকে দ্বিতীয় একটি রশ্মি দিয়ে ঘিরে রেখে শক্তির আধার (এনার্জি রিজার্ভার) হিসেবে কাজ করিয়ে মাঝের লেজার রশ্মিকে আগের চেয়ে আরো অধিক দূরত্বে নিক্ষেপ করা সম্ভব হবে। সেকেন্ডারি রশ্মি প্রাথমিক রশ্মিকে রিফুয়েল করবে এবং অধিক তীব্রতায় নির্গত হওয়া থেকে বাধা দেবে, যাতে এটি দ্রুত ভেঙে না যায়। এটাকে বলা হচ্ছে ‘এক্সটার্নালি রিফুয়েলড অপটিক্যাল ফিলামেন্টস’।

মেঘের মধ্যে পানির কনডেনসেশন এবং বজ্রপাত জনিত ঘটনা বিপুল পরিমাণে স্থির জড়তা সম্পন্ন চার্জড পার্টিক্যালের সাথে সম্পর্কিত। সঠিক মাত্রার লেজার রশ্মি দিয়ে এসব চার্জড পার্টিক্যালকে আলোড়িত করা গেলে নিকট ভবিষ্যতে এক দিন অবশ্যই বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং খরা নিয়ন্ত্রণে আসবে, এবং ইচ্ছামতো নির্দিষ্ট ভূমিতে এগুলো প্রয়োগ করা যাবে।

‘সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন ইন অপটিকস অ্যান্ড লেজার’ থেকে বলা হয়েছে, যখন কোনো লেজার রশ্মির তীব্রতা অনেক বেশি করা হয় সে তখন আর স্বাভাবিক আচরণ করে না এটি এর নিজের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। এই ধ্বংস হয়ে পড়ার সময় এর তীব্রতা এত বেশি মাত্রায় পরিণত হয় যে, বাতাসের অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের ইলেকট্রনগুলো ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি প্লাজমা তৈরি করে, যা সাধারণত ইলেকট্রনের এক স্যুপ। এই প্লাজমা তখন চেষ্টা করে লেজার রশ্মিকে উল্টো দিকে ধাবিত করতে, যা একটি আল্ট্রা শর্ট লেজার পালসকে ছড়িয়ে পড়ার এবং ধ্বংস হওয়ার মধ্যকার ঘটনায় এক ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়। এই যুদ্ধ বা রিঅ্যাকশনকে বলা হয় ‘ফিলামেন্টেশন’। এটা একটি ফিলামেন্ট বা ‘আলোর স্ট্রিং’ তৈরি করে, যা বাতাসের বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হওয়ার আগে অল্প সময়ের জন্য এগিয়ে চলে। যেহেতু একটি ফিলামেন্ট তার চলার পথে আলোড়িত ইলেকট্রন সৃষ্টি করে সে কারণে এটা বৃষ্টি ও বজ্রপাত ঘটানোর প্রয়োজনীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে।

HAARP প্রযুক্তি

নিত্য নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলছে বর্তমান বিশ্ব। তবে সকল প্রযুক্তির হাজারো উপকারী দিক থাকলেও প্রত্যেকটিরই কোনো না কোনো অপকারী দিক রয়েছে। কিন্তু কোনো একটি প্রযুক্তির উপকারী দিকের পরিবর্তে অপকারী দিকটিই যদি মুখ্য হয়ে উঠে তখন তা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠে। আর ব্যাপারটি যদি হয় দানবের মতো তবে বিপর্যয়ের পরিমাণ হবে ভয়াবহ। যা মানুষের চিন্তাভাবনাকেও কাঁপিয়ে দিতে পারে। এরকমই একটি বিষয় হলো হার্প।

HAARP মানে হলো High Frequency Active Auroral Research Project/Program.

এটি বিশ্বের আপাত ক্ষমতাবান অপরাধীদের দ্বারা চালিত একটি গোপন পরীক্ষা। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম ভাবে ভুমিকম্প, সুনামী ঘটানো সম্ভব। এটি পৃথিবীর যে কোনো এলাকার বায়ুমন্ডল, আয়নমন্ডল বা চৌম্বকমণ্ডলের পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি ও যন্ত্র। হার্প প্রযুক্তির মাধ্যমে আবহাওয়াকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর দ্বারা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত প্রতিপক্ষের এলাকায় আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলা যাবে। হার্প প্রযুক্তি, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর ভূ-তলের মধ্যভাগে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ প্রভাব ঘটাতে সক্ষম।

প্রথম ব্যক্তি যার মাথায় হার্পসদৃশ অস্ত্রের ধারণাটি আসে তিনি হচ্ছেন সাবীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা। নিকোলা টেসলা হার্প সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তার মৃত্যু পর্যন্ত। ‘কিভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে একে একটি অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগানো যায়’ শিরোনামে এক প্রবন্ধে তিনি হার্প সম্পর্কে লিখেছেন যে, ‘একে অনেকটা লেজার গানের সাথে তুলনা করা যায়। লেজার গানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমনভাবে নির্দিষ্ট একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত করে রশ্মিটি ফেলা হয়। এ ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটবে। শুধু রশ্মিটি আসবে প্রকৃতিক মাধ্যম থেকে।’

পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, হার্প একটি অস্ত্র। যা দিয়ে ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা, ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটানো সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের হার্প প্রকল্প থেকে জানা যায়, প্রকল্পে স্থাপিত অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্টেনাগুলো দিয়ে আয়নমণ্ডলে তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়। এই তরঙ্গ প্রেরণ করা হয় ভূমি থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্তী অবস্থান থেকে। এর ফলে সূর্যরশ্মির গমন পথে আহিত কণার সৃষ্টি হয়। এটি নিম্ন আয়নমণ্ডলে কম্পন সৃষ্টি করে। এই কাঁপুনির ফলে এক ধরনের সাময়িক অ্যান্টেনার উৎপত্তি ঘটে। এই অ্যান্টেনাগুলো পৃথিবীতে অনেক ক্ষুদ্র ও নিচু মাত্রার তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। এই তরঙ্গগুলো সাগরের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উচ্চমাত্রার তরঙ্গ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফিরে আসা এ তরঙ্গকে হার্প আবার পাঠাতে পারে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে। এছাড়া পৃথিবীর যে অংশে রাত থাকে সূর্যরশ্মি না থাকার ফলে সেখানে আয়নমণ্ডলের নিচের স্তরটি সাময়িক ভাবে অনুপস্থিত থাকে। এ কারণে হার্প পরীক্ষার জন্য রাত বেশি উপযোগী।

সূর্যের অভ্যন্তরে অগ্নিঝড়ের দমকা চলতে থাকে সারাক্ষণ। পর্যায় ক্রমে এর হার বাড়তে ও কমতে থাকে। একেকটি দমকার সাথে প্রচন্ড তাপবাহী সৌরশিখা সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এই শিখার সাথে তড়িৎচৌম্বক তেজস্ক্রিয়তার (EMR) আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। তেজস্ক্রিয় শিখা যখন পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে, তখন বায়ুমণ্ডলের বাইরের পরিমন্ডল কর্তৃক তা বাধাগ্রস্ত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠে থাকা মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়; কিন্তু হার্পের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট স্থানে বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরে ফাটল ধরিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট স্থানে সরাসরি তেজস্ক্রিয় শিখাকে প্রবেশের রাস্তা করে দেয়া হয় এবং এভাবে সৃষ্টি করা হয় প্রাকৃতিক দূর্যোগ।

আবর হার্প দ্বারা সরাসরি ভূমির অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ প্রেরণ করে তাতে ফাটল ধরানোর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় ভূমিকম্প ও সুনামি। পৃথিবীর উপরিতল একাধিক শক্ত স্তরে বিভক্ত। এগুলোকে টেকটোনিক প্লেট বলা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে এগুলো পৃথিবীর উপরিতলে এসে জমা হয়েছে। টেকটোনিক প্লেট মূলত পাথরের তৈরী, এর উপরিভাগ মাটি, বালি ও জীবাশ্ম দিয়ে তৈরী। টেকটোনিক প্লেট ১৫ কিলোমিটার থেকে ২০০ কিলোমিটার পুরু হতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা গলিত ম্যাগমা বা লাভার ওপর এগুলোর অবস্থান।

হার্প পরিচালনাকারীদের মতে, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ঘটনা সনাক্তকরণ এবং অনুসন্ধান করা। এর মাধ্যমে যে কাজগুলো করা যাবে তা হচ্ছে—

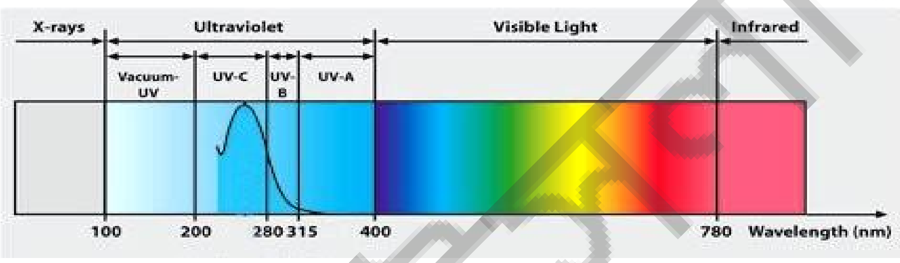
- আয়নমণ্ডলের বৈশিষ্ট, চরিত্র সনাক্ত করতে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কিত কিছু পরীক্ষা চালানো, যাতে করে ওজোনস্তরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়।
- আয়নমণ্ডলে লেন্সের মাধ্যমে অতি উচ্চকম্পাঙ্কের শক্তিকে ফোকাস করা এবং আয়নমণ্ডলের প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া।
- প্রেরিত ইনফ্রারেড বা অবলোহিত তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের ইলেকট্রন গুলোকে আরও গতিশীল করবে এবং অন্যান্য আলোক তরঙ্গ নির্গমনের মাধ্যমে রেডিও ওয়েভের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে।
- ভূ-চৌম্বকীয় গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে রেডিও তরঙ্গের প্রতিফলন নিয়ন্ত্রণ করা।
- পরোক্ষভাবে তাপ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত রেডিও ওয়েভ এর চলাচলের ওপর প্রভাব ফেলা যা আয়নমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণের সামরিক উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করে।
- আয়নমণ্ডলের ৯০ কিলোমিটার নিচে রেডিও ওয়েভের প্রতিফলক স্তর তৈরী করা, যা দিয়ে অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত নজরদারি করা যাবে।

অতিবেগুনী বা আল্ট্রাভায়োলেট বা UV রশ্মি

যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১০ ন্যানোমিটার থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের বলা হয় অতিবেগুনী রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট বা UV রশ্মি।

ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক অনুসারে দৃশ্যমান আলোকের পর আসে অতিবেগুনী রশ্মি। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান বেগুনী বর্ণের চেয়ে ছোটো কিন্তু রঞ্জন রশ্মি অপেক্ষা বড়। এই রশ্মির শক্তি ৩ ইলেকট্রন-ভোল্ট থেকে ১২৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট এবং কম্পাঙ্ক ৮×১০^{১৪} হার্টজ থেকে ৩×১০^{১৬} হার্টজ এর মধ্যে হয়। ১৮০১ সালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী জন উইলহেলম রিটার এ রশ্মি আবিষ্কার করেন।

অতিবেগুনি রশ্মির প্রকারভেদ



অতিবেগুনী বা আলট্রা-ভায়োলেট (UV) রশ্মিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. আলট্রাভায়োলেট -এ (UV-A)
2. আলট্রাভায়োলেট -বি (UV-B)
3. আলট্রাভায়োলেট -সি (UV-C)

আলট্রাভায়োলেট -এ (UV-A)

যে সকল অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ৩১৫ ন্যানোমিটার থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, তাদেরকে আলট্রাভায়োলেট -এ (UV-A) বলে। এটি নিয়ার আল্ট্রাভায়োলেট বা কালো আলো নামেও পরিচিত। অনেকসময় দৃশ্যমান আলোক বর্ণালির বেগুনী অংশটুকুও এদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

আলট্রাভায়োলেট -বি (UV-B)

যে সকল অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ২৮৯ ন্যানোমিটার থেকে ৩১৫ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, তাদেরকে আলট্রাভায়োলেট -বি (UV-B) বলে। এটি মিডল বা মধ্য আল্ট্রাভায়োলেট নামেও পরিচিত।

আলট্রাভায়োলেট -সি (UV-C)

যে সকল অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১০ ন্যানোমিটার থেকে ২৮৯ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, তাদেরকে আলট্রাভায়োলেট -সি (UV-C) বলে। এটি ফার আল্ট্রাভায়োলেট নামেও পরিচিত। আল্ট্রাভায়োলেট -সি রশ্মি কেবল বায়ুশুন্য এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে পারে বিধায় অনেকসময় একে ভ্যাকুয়াম (বায়ুশুন্য) বা এক্সট্রিম আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বলা হয়ে থাকে।

অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব

খুব ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মি তথা UV-C পরমাণুকে আয়নিত করতে পারে (আলোক তড়িৎ ক্রিয়া)। তবে, এই ব্যান্ডের মধ্যভাগের অতিবেগুনী রশ্মি তথা UV-B আয়নিত করতে পারে না, কিন্তু অণুর রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে।

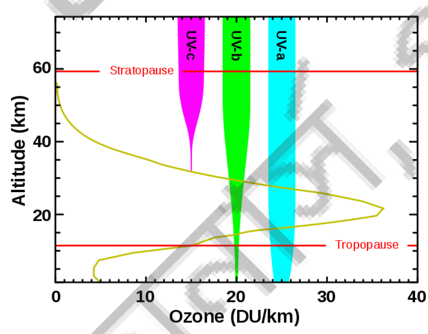
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত টিভি, টিউব লাইট, ট্যাব, কম্পিউটার এগুলোর থেকে আমরা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির সংস্পর্শ পাই। অতিবেগুনি রশ্মি প্রস্তুত করা হয় বিশেষ বাতি এবং ভীষণ উত্তপ্ত পদার্থ (যেমন: বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডা) দ্বারা। সূর্য হল অতিবেগুনি রশ্মির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সূর্য থেকে অতিবেগুনি রশ্মি বেশি ছড়ায় সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত, অর্থাৎ যখন ছায়া নিজের চেয়ে ছোট থাকে। আমরা যেহেতু বিষুব রেখার কাছাকাছি থাকি, তাই আমাদের দেশে UV-A এবং UV-B বেশি পাওয়া যায়। UV-B রশ্মি সান বার্নের কাজ করে থাকে।

অতি মাত্রায় এ রশ্মি শরীরে প্রবেশ করলে মেলানমা বা মেছতা হয়ে থাকে। যাদের ত্বকে ইউ মেলানিন বা তামাটে মেলানিনের মাত্রা বেশি তারা সূর্যালোকের সঙ্গে কিছুটা বেশি খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত। শ্যামবর্ণের মানুষ প্রখর সূর্যালোকে 'ট্যান' হয়, কিন্তু 'বার্ন' হয় না। ফলে তাদের ক্ষতির মাত্রা কিছুটা কম। আবার ইয়েলো মেলানিন যাদের বেশি, যেমন অস্ট্রেলিয়া বা পাশ্চাত্যের অনেক দেশে ত্বকের এই ফটো প্রোটেকশন ক্ষমতা কম। ফলে ত্বকে পোড়াটে ভাব আসে, ত্বকের বিশেষ ক্ষতিও হয়। অপরদিকে UV-A রশ্মি মানুষের ত্বকের কোষকে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা ত্বকের কর্কট রোগের (skin cancer) অন্যতম কারণ। এছাড়াও অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকের আরও কিছু ক্ষতি করতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ত্বকের ওপর পড়লে ত্বকের নিচের কানেকটিভ টিস্যুর কোষগুলো ভেঙে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে ত্বকের টান টান ভাব নষ্ট হয়। যাঁরা সূর্যের আলোতে বেশি কাজ করে, তাঁদের ত্বক দ্রুত বুড়িয়ে যায়, কুঁচকে যায়, বলিরেখা পড়ে। তা ছাড়া সূর্যের আলোয় ত্বক দ্রুত আর্দ্রতা হারায়। এই সমস্যা গুলোকে ফটোড্যামেজ বলা হয়। এর বাইরে তিল পড়া, কালো পিগমেন্টেশন হওয়া, মেছতা পড়া, ডার্ক স্পট, কেরাটোসিস ইত্যাদির কারণও এই অতিবেগুনি রশ্মি। এই রশ্মি কোষের ডিএনএ (DNA) অণুকে অপূরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এছাড়া অতিবেগুনি রশ্মির অতিরিক্ত মাত্রার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক হচ্ছে—

- চর্ম ক্যান্সার হতে পারে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- চোখে ছানি ও অন্ধত্ব হতে পারে।
- খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।
- মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং গাছপালায় অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

অতিবেগুনী রশ্মির বিশোষণ



পৃথিবীর ওজোন স্তরের সাপেক্ষে অতিবেগুনী রশ্মির প্রবেশ

সূর্য যথেষ্ট পরিমানে অতিবেগুনী রশ্মি বিকীর্ণ করে, যা প্রায় তার সমগ্র শক্তির ১০%। এর মধ্যে আছে খুব কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যর অতিবেগুনী রশ্মি তথা UV−C রশ্মি, যা পৃথিবীর স্থলভাগের বেশিরভাগ প্রাণীজগতকে ধ্বংস করতে সক্ষম (সমুদ্রের জল সেখানকার প্রাণীজগতকে কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করে)। তবে সূর্য থেকে বিকীর্ণ এই ক্ষতিকারক UV−C রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছনোর আগেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা বিশোষিত হয়। অতিবেগুনী রশ্মির অধিক শক্তি সম্পন্ন অংশ (কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন দ্বারা এবং অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য অক্সিজেন দ্বারা বিশোষিত হয়।

মধ্যবর্তী শক্তি সম্পন্ন অতিবেগুনী রশ্মি ওজোন স্তর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই স্তরে UV−B রশ্মি বিশোষিত হয়। তবে খুব কম শক্তি সম্পন্ন অংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তা বায়ুমণ্ডল দ্বারা বিশোষিত হয় না। এর ফলে ভূপৃষ্ঠে আসা সূর্য রশ্মির মধ্যে ৩% -এর কম অতিবেগুনী রশ্মি থাকে। এর মধ্যে থাকে কম শক্তি সম্পন্ন আল্ট্রাভায়োলেট -এ (UV-A) এবং কিছুটা আল্ট্রাভায়োলেট -বি (UV-B)।

খুব কম শক্তি সম্পন্ন অতিবেগুনী রশ্মি তথা UV-A রশ্মি বায়ুমণ্ডল দ্বারা ভালোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তবে এই অঞ্চলের অতিবেগুনী রশ্মি কম ক্ষতিকারক।

সাধারণ কাঁচ অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করতে পারে। তাই, কাঁচের জানালা দিয়ে রোদ প্রবেশ করলে চামড়া তামাটে হয় না বা কেউ রোদে পুড়ে যায় না।

অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবহার

জাল টাকা বা জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

টাকা বা পাসপোর্টের উপর যে কালির প্রলেপ দেওয়া হয় তাতে এমন UV ফ্লোরোসেন্স উপাদান থাকে, যাতে করে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির UV আলো পড়লেই কেবল এটি আলোককে প্রতিফলিত করে। এ কালি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UV আলোর নিচেই দৃশ্যমান হয়। সাধারণ অবস্থায় এটি খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। UV রশ্মি উৎপাদনকারী যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UV আলো যখন ব্যাংক নোট বা পাসপোর্টের উপর ফেলা হয় তখন বিশেষ কালিত উপস্থিত ফ্লোরোসেন্স ফসফোর বিক্রিয়া করে অনুপ্রভার মাধ্যমে দৃশ্যমান আলো সৃষ্টি করে। কিন্তু জাল টাকা বা পাসপোর্টে ফ্লোরোসেন্স ফসফোর নামক কালি না থাকায় তা অনুপ্রভার সৃষ্টি করতে পারে না। এজন্য UV রশ্মি দ্বারা অতি সহজে প্রকৃত ব্যাংক নোট বা জাল টাকা কিংবা জাল পাসপোর্ট শনাক্ত করা যায়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে অতীবেগুনী রশ্মির ব্যবহার

তরঙ্গদৈর্ঘ্য	ব্যবহার
২৩০-৪০০ ন্যানোমিটার	আলোক সম্বন্ধীয় সেন্সর, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরী
২৩০-৩৬৫ ন্যানোমিটার	পরিচয়পত্র, বারকোড, লেবেল সনাক্তকরণ
২৪০-২৮০ ন্যানোমিটার	জীবাণুনিরোধ, জিনিসপত্রের আবরণ এবং পানির পরিশোধন (সর্বোচ্চ DNA পরিশোষণ হয় ২৬০ nm)
২৫০-৩০০ ন্যানোমিটার	ফরেন্সিক বিশ্লেষণ, মাদক সনাক্তকরণ
২৭০-৩৬০ ন্যানোমিটার	প্রোটিন বিশ্লেষণ, ডিএনএ সংশ্লেষণ, ঔষধ আবিষ্কার
২৮০-৪০০ ন্যানোমিটার	কোষের চিকিৎসা-শাস্ত্রগত ইমেজিং
৩০০-৪০০ ন্যানোমিটার	Solid-state lighting
৩০০-৩৬৫ ন্যানোমিটার	পলিমারের সংস্কার এবং মুদ্রণযন্ত্রের কালি
৩০০-৩২০ ন্যানোমিটার	আলোক নিরাময় চিকিৎসা
৩৫০-৩৭০ ন্যানোমিটার	পোকা আকৃষ্ট করতে (মাছি ৩৬৫ ন্যানোমিটার আলোতে সর্বাপেক্ষা আকর্ষিত হয়)

এক্স-রে (X-ray) বা রঞ্জন রশ্মি বা রন্টজেন রশ্মি

যে সকল তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১০ ন্যানোমিটার থেকে ০.০১ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের বলা হয় এক্স-রে (X-ray) রশ্মি। একে রঞ্জন রশ্মি বা রন্টজেন রশ্মি নামেও অভিহিত করা হয়।

তীব্র গতি সম্পন্ন ইলেকট্রন প্রবাহ তথা ক্যাথোড রশ্মি উচ্চ গলনাংক বিশিষ্ট কোনো ভারী ধাতুকে আঘাত করলে, ইলেকট্রনের গতিশক্তি রূপান্তরিত হয়ে এক প্রকার তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ উৎপন্ন করে। এই বিকিরণকে এক্স রশ্মি বলে।

ক্রমহ্রাসমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক অনুসারে অতিবেগুনী রশ্মি পর আসে রঞ্জন রশ্মি। রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক কম বলে দর্শন অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না। খুব ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির মতো রঞ্জন রশ্মি পরমাণুকে আয়নিত করতে পারে। এছাড়াও অধিক শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় রঞ্জন রশ্মি পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে থাকে, যা কম্পটন প্রক্রিয়া (Compton effect) নামে পরিচিত।

এক্স রশ্মির প্রকারভেদ

এক্স-রে বা এক্স রশ্মি সাধারণত দুই প্রকার। যথা—

1. কোমল এক্স-রে (Soft X-ray)
2. কঠিন এক্স-রে (Hard X-ray)

কোমল এক্স-রে (Soft X-ray)

এক্স-রে যন্ত্রে কম বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে যে এক্স-রে পাওয়া যায় অর্থ্যাৎ যে এক্স-রে'র তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি, ফলে ভেদন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম, তাকে কোমল এক্স-রে (Soft X-ray) বলে। এদের কম্পাঙ্ক 3×10^{16} হার্টজ থেকে 3×10^{18} হার্টজ এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০ ন্যানোমিটার থেকে ১০০ পিকোমিটারের মধ্যে।

কঠিন এক্স-রে (Hard X-ray)

এক্স-রে যন্ত্রে বেশি বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে যে এক্স-রে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে এক্স-রে'র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম, ফলে ভেদন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি, তাকে কঠিন এক্স-রে (Hard X-ray) বলে। এদের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক $১০^{১৮}$ হার্টজ থেকে $১০^{২০}$ হার্টজ আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০ পিকোমিটার থেকে ১ পিকোমিটার।

কোমল এক্স-রে অপেক্ষা কঠিন এক্স-রে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোটো। ফলে কঠিন এক্স-রে পদার্থের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় খুব কম মাত্রায় বিশোষিত হয়।

এক্স রশ্মির একক

এক্স রশ্মির একক হল রন্টজেন (Roentgen)। এক রন্টজেন বলতে সেই পরিমাণ বিকিরন বুঝায় যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় এক মিলিমিটার বায়ুতে এক স্থির বৈদ্যুতিক আধানের সমান আধান উৎপন্ন করতে পারে।

রঞ্জন রশ্মির **ব্যবহার**

বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহার

পরমাণুর গঠন বিষয়ক নানা পরীক্ষায় এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এক্স রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন কেলাসের গঠন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। হীরের মত দামী পাথর বিশুদ্ধ কিনা তা এক্স রশ্মির সাহায্যে জানা যায়। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা আছে কিনা জানতে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

উচ্চ শক্তির পদার্থবিদ্যায় রঞ্জন রশ্মি ভেদনকার্যে (as a probe) ব্যবহৃত হয়। নিউট্রন তারার চারিদিকে থাকা অ্যাক্রিশন ডিস্ক (accretion disks) এবং কৃষ্ণ বিবর থেকে যে রঞ্জন রশ্মি বিকিরিত হয় জ্যোতির্বিদ্যায় তা পর্যবেক্ষন করে পদ্ধতিগুলি বোঝার চেষ্টা করা হয়। নক্ষত্রদের করণা (coronas) তথা আলোকমণ্ডল এবং নীহারিকা থেকে রঞ্জন রশ্মি বিকিরিত হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল রঞ্জন রশ্মির সাপেক্ষে অস্বচ্ছ হওয়ায় মহাজাগতিক রঞ্জন রশ্মি পর্যবেক্ষন করার জন্য ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে বায়ুমণ্ডলের বাহিরে স্থাপন করা হয় ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহার

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের কাজে রঞ্জন রশ্মি চিত্রণের (X-ray imaging) ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতি রেডিওথেরাপী (radiography) নামে পরিচিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে X-ray এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো—

- স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে দাগ বা ফাটল, ভেঙ্গে যাওয়া হাড়, শরীরের ভিতরের কোন বস্তুর বা ফুসফুসের ক্ষত, দাঁতের ক্যারিস ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
- সিটি স্ক্যান হল কম্পিউটারের সাহায্যে রঞ্জন রশ্মি দ্বারা গৃহীত চিত্র সমন্বয় করে ত্রিমাত্রিক বা প্রস্থচ্ছেদ চিত্র বানানোর ব্যবস্থা।
- ক্যান্সারের চিকিৎসায় রঞ্জন রশ্মি বিকিরণ ব্যবহৃত হয়।
- পরিপাক (Digestive) নালী দিয়ে খাদ্যবস্তুর গমন পথ অনুসরণ, আলসার নির্ণয় ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

শিল্পে ব্যবহার

- ধাতব ঢালাইয়ের দোষ ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং, ধাতব পাতের গর্ত ইত্যাদি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
- কেলাস গঠন পরীক্ষায় এক্সরে ব্যবহৃত হয় এবং মণিকারেরা এর সাহায্যে আসল ও নকল গহনা চিহ্নিত করতে পারেন।
- টফি লজেন্স, সিগারেট ইত্যাদির মান বজায় আছে কিনা বা টফি ও লজেন্সে ক্ষতিকর কোন কিছু মিশ্রিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গোয়েন্দা বিভাগে ব্যবহার

- কাঠের বাক্স বা চামড়ার থলিতে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে তা খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়।
- কাস্টম কর্মকর্তারা চোরাচালানের দ্রব্যাদি খুঁজে বের করতে ব্যবহার করেন।

রঞ্জন রশ্মির **আবিষ্কার**

কোনো কোনো ধাতুর উপর আলো পড়লে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রন নির্গত হয় তথা ফোটন কণিকার আঘাতে ধাতুপৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এ ঘটনাকে ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলে। অন্যভাবে বললে ফোটন কণিকা ইলেকট্রন বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন উল্লিখিত ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন, সেজন্য তাকে (আইনস্টাইন) ১৯২১ সালে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

এরপরই যে সামনে আসে তা হচ্ছে, বিপরীত আলোক তড়িৎক্রিয়া বা ইনভার্স ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট (inverse photoelectric effect) সম্ভব কিনা যেখানে ইলেকট্রনের গতিশক্তি ফোটনে রুপান্তরিত হবে। আসলে বিজ্ঞানীদের গবেষণার আগেই ইনভার্স ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্ট আবিষ্কৃত হয়েছিলো কিন্তু সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তারা। এই ইনভার্স ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট'ই হচ্ছে রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে নির্গমনের ঘটনা।

১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম রন্টজেন তড়িৎক্ষরন নলে (discharge tube) 10^{-3} mm পারদ চাপে বায়ুর মধ্যে তড়িৎরক্ষনের পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন নল থেকে কিছু দূরে অবস্থিত বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড আবৃত পর্দায় প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হচ্ছে। পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎক্ষরন নল থেকে ক্যাথোড রশ্মি তথা দ্রুতগতির ইলেকট্রন ধাতু পৃষ্ঠে আঘাত হানলে এই অদ্ভুত রকমের বিকিরণ (রশ্মি) সৃষ্টি হচ্ছে। এই রশ্মি বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না, সরলরেখায় চলে এবং ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি। কাঠ, চামড়াসহ অনেককিছু ভেদ করার ক্ষমতা রয়েছে অজানা এ রশ্মির। অজানা বলেই নাম দেয়া হয় এক্স-রে বা এক্স রশ্মি।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন এক্স রশ্মির প্রতিপ্রভা ধর্ম রয়েছে ফলে ফসফরে পড়লে দৃশ্যমান আলো উৎপন্ন হয় এবং ফটোগ্রাফিক প্লেটে দাগ সৃষ্টি করতে পারে। দ্রুতই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এক্স-রে আসলে একধরণের তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ।

তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়, কোনো চার্জিত কণা স্থির থাকলে তার চারপাশে একটি তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। আবার, কোনো চার্জিত কণা যদি গতিশীল হয় তাহলে সেই কণার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। অর্থাৎ চার্জিত কণিকার ত্বরণ ঘটলে সেখান থেকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ উৎপন্ন হবে। রন্টজেনের পরীক্ষায় গতিশীল ইলেকট্রন ধাতুপৃষ্ঠে আঘাতের পর থেমে যায়।

যেহেতু শক্তি ধ্বংস হয় না, এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রুপান্তরিত হয় মাত্র। ক্যাথোড রশ্মি প্রচণ্ড বেগে ক্যাথোড থেকে অ্যানোড এর দিকে যায় ওর গতিপথে কোন কঠিন বস্তু রাখলে, বাধা পেয়ে গতিশক্তি হারায়। তখন ক্যাথোড রশ্মির (ইলেকট্রন) প্রচন্ড গতিশক্তির কিছুটা তাপ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। এবং বাকি অংশ একরকম অদৃশ্য রশ্মির সৃষ্টি করে। ক্যাথোড রশ্মি যেখানে বাধা পায়, সেখান থেকে এই অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়।

প্রচন্ড গতিশীল ইলেকট্রন প্রবাহ (ক্যাথোড রশ্মি) কোন কঠিন বস্তুর ওপর গিয়ে পড়লে ওই বস্তু থেকে আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। এই শক্তিশালী অদৃশ্য রশ্মির নাম এক্স রশ্মি (X-ray)

ক্যাথোড রশ্মির খুব সামান্য অংশ 0.1% ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রঞ্জন রশ্মিতে রুপান্তরিত হয়।

বিজ্ঞানী উইলিয়াম রন্টজেন ১৯০১ সালে বিশ্বের প্রথম নোবেল বিজয়ী, যা তিনি এক্স রশ্মি (X-ray) আবিষ্কারের জন্য পেয়েছিলেন।

তড়িৎ ক্ষরণ

কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহকে তড়িৎ ক্ষরণ বলা হলেও সাধারণত তড়িৎ ক্ষরণ বলতে গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকেই বোঝানো হয়।

তড়িৎ ক্ষরণ নল

নিম্নচাপে বায়ুর মধ্য দিয়ে তড়িৎ ক্ষরণের পরীক্ষা চালানোর জন্য প্রায় 4 cm ব্যাসের 30 cm লম্বা দুই মুখ বন্ধ যে কাচনল ব্যবহার করা হয়, তাকে ক্ষরণ নল বা তড়িৎ ক্ষরণ নল বলে। একে তড়িৎ মোক্ষণ নল নামেও অভিহিত করা হয়।

অন্যভাবে, যে কাচনলে নিম্নচাপের গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হয় তাকে তড়িৎ ক্ষরণ নল বা তড়িৎ মোক্ষণ নল কিংবা ক্ষরণ নল বলা হয়।

রঞ্জন রশ্মির উৎপাদন

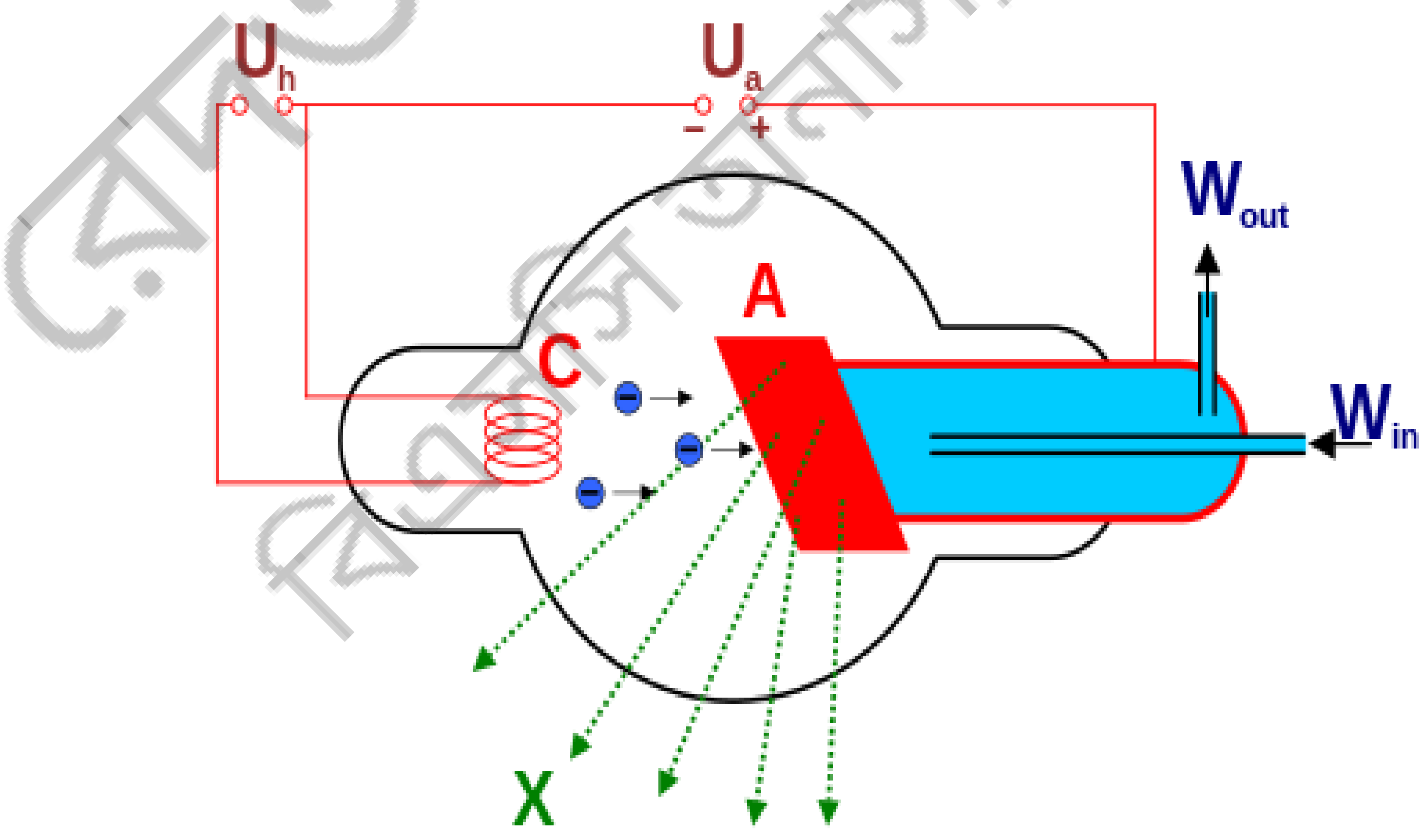
তিনটি পদ্ধতিতে এক্সরশ্মি উৎপাদন করা হয়। যথা—

1. গ্যাস নল পদ্ধতি
2. কুলিজ নল পদ্ধতি
3. বিটাট্রন বা কণাত্বরক পদ্ধতি

গ্যাস নল পদ্ধতি

চিকিৎসার জন্য যে যন্ত্রের সাহায্যে এই রশ্মি উৎপাদন করা হয়, তার নাম এক্স-রে টিউব। এটি একটি ক্ষরণ বা তড়িৎ ক্ষরণ বা তড়িৎ মোক্ষণ নল।

নলের দুপ্রান্তে যুক্ত দুটি তড়িৎদ্বার অ্যানোড ও ক্যাথোডের ভিতর উচ্চ বিভব-প্রভেদ (30,000 থেকে 50,000 ভোল্ট) প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেকট্রনের স্রোত তীব্র বেগে উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট প্লাটিনাম বা টাংস্টেনের ধাতুর অ্যানোডে (টার্গেট) আঘাত করে এবং ইলেকট্রনের গতিশক্তির একাংশ এক্স-রশ্মি রূপে টার্গেট থেকে নিঃসৃত হয়। প্রচন্ড গতিবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন টার্গেটে আঘাত করার ফলে প্রচুর পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ অপসারণের জন্য শীতল জলের প্রবাহ ঘটিয়ে টার্গেটকে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়।

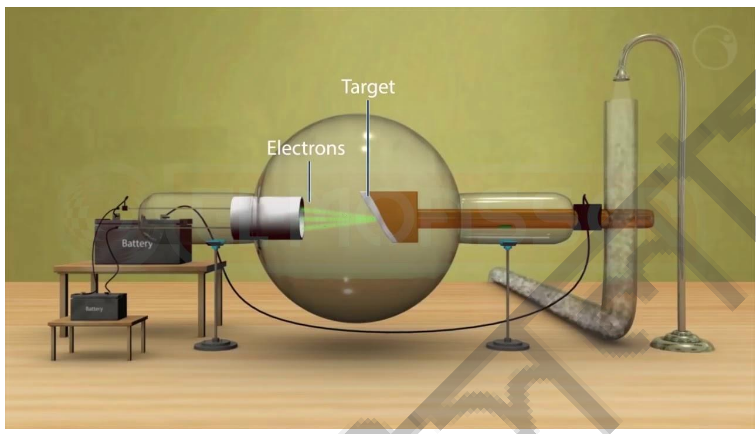


এক্সরে টিউবের প্রধান অংশের চিত্র

এক্ষেত্রে একটি ফিলামেন্ট (C) ক্যাথোডের কাজ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে সেটিকে উত্তপ্ত করা হলে তাপ আয়নিক নিঃসরণের মাধ্যমে ইলেকট্রন নির্গত হয়। টিউবের অন্য প্রান্তে ভারী ধাতুর তৈরী একটি অ্যালোড (A) থাকে। উচ্চমাত্রার বৈদ্যুতিক বিভব পার্থক্যের কারণে ইলেক্টন অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। ইলেকট্রনের চলার পথকে নির্বিঘ্ন করতে টিউবকে বায়ুশূন্য করা হয়। আর অ্যানোড প্রান্তটি ফিলামেন্ট থেকে দ্রুতবেগে আসা ইলেকট্রন প্রবাহ তথা ক্যাথোড রশ্মির টার্গেট হিসেবে কাজ করে। অ্যানোড প্রান্তটিকে বাঁকা বা ঢালু অবস্থায় রাখা হয় যাতে টার্গেট থেকে বেরিয়ে আসা এক্স রশ্মি টিউব থেকে বাইরের দিকে চলে যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনের গতিশক্তি এক্স-রে'তে রূপান্তরিত হয়।

কুলীজ নল পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে যে যন্ত্রের সাহায্যে এই রশ্মি উৎপাদন করা হয়, তার নাম কুলীজ টিউব বা কুলীজ নল। এই যন্ত্রে একটি কাঁচের গোলক থাকে। এই গোলকের মধ্যে প্রায় 10^{-5} মিমি পারদ স্বম্ভের চাপে বায়ু রাখা থাকে। গোলকটিতে পরস্পরের মুখোমুখি দুটি পার্শ্বনল থাকে। পার্শ্বনলের একটিতে ক্যাথোড (C) এবং অন্যটিতে অ্যানোড (A) প্রবেশ করানো থাকে। ক্যাথোড (C) হল টাংস্টেন তারের তৈরি একটি সরু ফিলামেন্ট। এই ফিলামেন্টটি মলিবডিনাম ধাতুর তৈরি একটি চোঙের মধ্যে রাখা থাকে। অ্যানোডটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট টাংস্টেন ধাতুর পাত (A) । এই পাতটিকে ক্যাথোড ও অ্যানোড সংযোগকারী সরলরেখার সঙ্গে 45° কোণে আনত রাখা হয়।



কুলীজ নল

এক্ষেত্রে প্রথমে ক্যাথোড C -কে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা প্রায় 2000°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় এই ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই অবস্থায় ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে খুব উচ্চ ভোল্টের বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি করলে, উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে তীব্রবেগে ইলেকট্রন নির্গত হতে থাকে। এই তীব্র গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলি অ্যানোড পাতে ধাক্কা খায়, এর ফলে অ্যানোড পাত থেকে এক্স-রশ্মি নির্গত হয়। অ্যানোড পাতটি ইলেকট্রন কণার সঙ্গে সংঘর্ষে খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাই রেডিয়েটারের সাহায্যে বা জলপ্রবাহ দ্বারা অ্যানোড পাতটিকে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা থাকে। কুলীজ নলে 10^{-5} মিমি পারদস্বম্ভ চাপে বায়ুপূর্ণ থাকে। কম চাপে বায়ু থাকায় প্রচন্ড গতিশীল ইলেকট্রনগুলি বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষে বেশি গতিশক্তি হারায় না। কুলীজ নলে 50,000 থেকে 1,00,000 ভোল্ট পর্যন্ত উচ্চ বিভব প্রয়োগ করে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং বেশি ভেদ ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স-রশ্মি উৎপন্ন করা হয়।

বিটাট্রন বা কণাত্বরক প্রযুক্তির মাধ্যমে এক্স-রে উৎপাদন

আগেই উল্লেখ করেছি ইলেক্ট্রনের ত্বরনের ফলে এক্স-রে উৎপন্ন হয়। কণাত্বরক যন্ত্র বা পার্টিকেল এক্সিলারেটরে (particle accelerator) ইলেক্টনের ত্বরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। সেখানকার বৃত্তাকার পথে প্রচন্ড বেগে ভ্রমণের সময় সৃষ্ট কৌণিক ত্বরণেন কারণে প্রয়োজনীয় শক্তি তৈরী হলে এক্স-রে উৎপন্ন হয়।

কুলীজ নল

বিজ্ঞানী কুলীজের [Coolidge] তৈরি এক্স-রশ্মি যন্ত্রই বর্তমানে এক্স-রশ্মি উত্পন্নের জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটিকে কুলীজ নল [Coolidge tube] বলে।

কণাত্বরক

আধানযুক্ত কণাকে অতি উচ্চ গতিবেগ ও শক্তিতে ত্বরিত ও সম্মুখে প্রচালন করার যন্ত্রের নাম কণাত্বরক যন্ত্র।

রঞ্জন রশ্মির ধর্ম

1. এ রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।

2. কোন বস্তুর ওপর এক্স রশ্মি পড়লে বস্তুটি উত্তপ্ত হয় না।

3. এটি অত্যধিক ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ার কারণে এক্স-রে অ্যালুমিনিয়াম, চামড়া, কাগজ, কাঠ, মাংসপেশি প্রভৃতিকে ভেদ করতে পারে। এক্স রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হয়, ভেদন ক্ষমতাও তত বেড়ে যায়। তাই তুলনামূলকভাবে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কঠিন এক্স-রের ভেদন ক্ষমতা বেশি। এবং বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোমল এক্স-রের ভেদন ক্ষমতা কম। সস্ট এক্সরে বা কোমল এক্স রশ্মি মাংসপেশি ভেদ করে যেতে পারে কিন্তু হাড় ভেদ করতে পারে না। এক্স রশ্মির এই ধর্মের জন্য ওই রশ্মির সাহায্যে শরীরের মধ্যে হাড়ের ছবি নেওয়া যায়। কঠিন এক্স-রশ্মি দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক।

4. এটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট, কম্পাঙ্ক খুব উচ্চ। এক্স রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম বলে ভেদন ক্ষমতা বেশি। বাল্বের ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মধ্যে বিভব পার্থক্য যত বেশি হবে ভেদন ক্ষমতা তত বেশি হবে।

5. এক্স-রে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ, তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা এটি বিচ্যুত হয় না।

6. সাধারণ আলোর ন্যায় এক্সরের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমাবর্তন হয়ে থাকে।

7. ধাতব পাতের উপর এক্স রশ্মি পড়লে অনেক সময় গৌণ এক্স রশ্মির সৃষ্টি হয়।

8. দৃশ্যমান আলোর ন্যায় ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এক্স রশ্মির প্রতিক্রিয়া আছে। এক্স-রের প্রভাবে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে প্রতিপ্রভা দেখা যায় এবং ফিল্ম কালো হয়ে যায়।

9. এ রশ্মির আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আছে। যেমন কয়েকটি বিশেষ ধাতু (সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম ইত্যাদি) আছে যাদের উপর এক্সরে পড়লে ওই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ঘটনাকে ফটোতড়িৎ ক্রিয়া বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে।

10. জিঙ্ক সালফাইড, বেরিয়াম, প্লাটিনোসায়ানাইড প্রভৃতি পদার্থে এ রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

11. এটা আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরন। এক্স-রে কোন গ্যাসের মধ্যে দিয়ে গেলে, গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে। এটি গ্যাসের অনুগুলির আয়নে বিশ্লিষ্ট করে গ্যাসকে উত্তম তড়িৎ পরিবাহীতে পরিণত করে।

12. এটি আধান নিরপেক্ষ।

13. এক্স-রে অদৃশ্য। দৃশ্যমান আলোক রশ্মির চেয়ে এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম বলে এটি রেটিনায় পড়লে দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায় না।

14. এক্স-রে রশ্মি তীব্রতা ব্যস্তানুপাতিক সূত্র মেনে চলে।

15. এটি জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করতে পারে। এক্স-রের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ক্যান্সার রোগগ্রস্থ দেহকোষের ওপর এক্স রশ্মি ফেলে ক্যান্সার রোগগ্রস্থ কোষগুলো নষ্ট করা হয়। একে এক্সরে থেরাপি বলে। বেশি মাত্রায় এক্স রশ্মি প্রয়োগকে প্রাণীদেহে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

16. এটি আলোর বেগে অর্থাৎ প্রায় 3×10^{8} ms^{-1} বেগে গমন করে।

17. এক্স-রে পদার্থ দ্বারা শোষিত হয়। যে পদার্থের ঘনত্ব যত বেশি সেই পদার্থ ততো বেশি এক্সরে শোষণ করতে পারে।

18. কেলাসের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় এক্স রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়।

তড়িৎদ্বার: অ্যানোড ও ক্যাথোড

তড়িৎদ্বার

তড়িৎ রাসায়নিক কোষে বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে যে দুটি ইলেকট্রনীয় পরিবাহী অর্থাৎ ধাতব দন্ড বা গ্রাফাইট দন্ড প্রবেশ করানো হয় তাদেরকে তড়িৎদ্বার বলে। তড়িৎদ্বার দুই প্রকার। যথা—

1. অ্যানোড

2. ক্যাথোড

অ্যানোড

যে তড়িৎদ্বারে জারণ ঘটে, তাকে অ্যানোড বলে। অর্থাৎ যে তড়িৎদ্বার ইলেকট্রন গ্রহন করে, কোনো মৌল বা মূলক বা আয়নের জারণ ঘটায়, সেই তড়িৎদ্বারকে অ্যানোড বলে।

কোন মৌল বা মূলক বা আয়ন অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিজে জারিত হয় বলে, অ্যানোডে জারণ ঘটে।

ক্যাথোড

যে তড়িৎদ্বারে বিজারণ ঘটে, তাকে ক্যাথোড বলে। অর্থাৎ যে তড়িৎদ্বার ইলেকট্রন ত্যাগ করে, কোনো মৌল বা আয়নের বিজারণ ঘটায়, সেই তড়িৎদ্বারকে ক্যাথোড বলে।

কোনো মৌল ইলেকট্রন গ্রহন করে নিজে বিজারিত হয় বলে, ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে।

ক্যাথোড রশ্মি

0.01 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপে ক্ষরণ নলের মধ্যে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে প্রচন্ড বেগে প্রবাহমান ইলেকট্রন কণার স্রোতকে ক্যাথোড রশ্মি বলে। অর্থাৎ, ক্যাথোড রশ্মি হলো তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন কণা অদৃশ্য স্রোত।

ক্ষরণ নলের মধ্যে 0.01 মিলিমিটার চাপে বাতাস রেখে দুই তড়িৎদ্বারের মধ্যে 10 হাজার ভোল্ট বা তার বেশি বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করলে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে একরকম রশ্মি নির্গত হয়, এবং ক্ষরণ নলের কাচের দেওয়ালে আপতিত হয়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন এর নাম দেন ক্যাথোড রশ্মি। তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা এই রশ্মির বিক্ষেপ লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীর জে জে টমসন প্রমাণ করেন যে, এই অদৃশ্য রশ্মি ইলেকট্রন কনার প্রবাহ মাত্র। উচ্চ বিভব সম্পন্ন ক্যাথোডের প্রবল বিকর্ষণে বাতাসের মধ্যে থাকা মৌলের পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলি কক্ষচ্যুত হয়ে অ্যানোডের দিকে ছুটে যায়। এই জন্য এই রশ্মির নাম ক্যাথোড রশ্মি দেওয়া হয়।

ক্যাথোড রশ্মির ধর্ম

টমসন, ক্রুক্স, গোল্ডস্টাইন প্রমূখ বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ক্যাথোড রশ্মির বিভিন্ন ধর্ম আবিষ্কার করেন। যথা—

- ক্যাথোড রশ্মি ক্যাথোড থেকে লম্বভাবে নির্গত হয় এবং সরল রেখায় চলে।

আলো যেমন সরলরেখায় চলে অস্বচ্ছ বস্তুর ছায়া সৃষ্টি করে, তেমনি ক্যাথোড রশ্মির গতিপথে কোন অস্বচ্ছ বস্তুর রাখলে কাঁচের দেয়ালের উপর ঐ বস্তুর স্পষ্ট ছায়া পড়তে দেখা যায়।

ক্ষরন নলের মধ্যে ক্যাথোড থেকে কিছু দূরে ক্যাথোডের সমান্তরালে একটি অভ্রের চক্র রাখা হলো। ক্যাথোড রশ্মির ধর্ম প্রমাণ করার জন্য কাচের নলটিকে অ্যানোডের দিকে বেশি চওড়া করা হয়। এবং সরু প্রান্তের দিকে ক্যাথোডটি একটি চাকতির আকারে রাখা হল। এবার নলে ক্যাথোড রশ্মির সৃষ্টি করা হলে বিপরীত দেয়ালে চক্রটির একটি সুস্পষ্ট ছায়া পড়বে। এ ছাড়া আর কোন উপচ্ছায়া থাকে না। এই পরীক্ষাটি প্রমাণ করে ক্যাথোড রশ্মি ক্যাথোড তল থেকে অভিলম্ব বরাবর নির্গত হয়ে সরলরেখায় চলে।

- ক্যাথোড রশ্মি নেগেটিভ তড়িৎ বহন করে এবং কঠিন পদার্থ ভেদ করে।

ক্যাথোড রশ্মি সোনা রুপা অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি খুব পাতলা পাতকে ভেদ করে যেতে পারে।

ক্যাথোডের বিপরীত দিকের দেয়ালে ছোট ছিদ্র করে ওই ছিদ্রটি 0.001 মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে বন্ধ করে ক্যাথোড রশ্মি উৎপন্ন করলে এই পাতলা অ্যালুমিনিয়াম পাত ভেদ করে ক্যাথোড রশ্মি বেরিয়ে আসে। ওই বেরিয়ে আসা রশ্মিকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের উপর ফেলে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রশ্মির কণাগুলি নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ক্যাথোড রশ্মি নেগেটিভ তড়িৎ প্রবাহ। প্রত্যেক ক্যাথোড কণায় তথা প্রত্যেক ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক এবং চার্জের পরিমাণ 1.6×10^{-19} কুলম্ব।

ক্যাথোড রশ্মি যখন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত পাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে বেঁকে যায়। তখন বোঝা যায় যে, ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলি ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত।

- ক্যাথোড রশ্মি কোন পদার্থের উপর পড়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

ক্যাথোড রশ্মি নলের কাঁচের দেয়ালের উপর পড়ে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে। কাচ, জিংক সালফাইট, বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড প্রভৃতির উপর ক্যাথোড রশ্মি আপতিত হয়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। ক্যাথোড রশ্মি যে বস্তুর উপর আপতিত হয়, সেই বস্তুর প্রকৃতির ওপর প্রতিপ্রভার রং নির্ভর করে, যেমন, কাঁচে সবুজ, অ্যালুমিনিয়ামে লাল, টিন স্টোনে হলুদ প্রভৃতি।

- ক্যাথোড রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে নষ্ট করে দেয়।

সাধারণ আলোকরশ্মির মত ক্যাথোড রশ্মিও ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্রিয়া করে এবং ফটোগ্রাফিক প্লেটকে নষ্ট করে দেয়।

- ক্যাথোড রশ্মির ভরবেগ এবং গতিশক্তি আছে।

ক্যাথোড রশ্মির আঘাতে বস্তুর মধ্যে গতির সৃষ্টি হয়। একটি হালকা দন্ডের সঙ্গে চারটি হালকা পাত আটকে দন্ডটিকে দুটি সূচিমুখের উপর বসিয়ে, কোন পাতের উপর ক্যাথোড রশ্মি ফেললে, পাতাগুলো ঘুরতে থাকবে। এ থেকে বোঝা যায়, এই রশ্মির ভরবেগ আছে। অর্থাৎ রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র ভরবিশিষ্ট কণার স্রোত।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রতি ক্যাথোড রশ্মির প্রতি কণা তথা একটি ইলেকট্রনের ভর 9.11×10^{-28} গ্রাম অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 1887 ভাগের এক ভাগের সমান।

- ক্যাথোড রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হয়।

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হলে, পরিবাহীতে চৌম্বক ক্ষেত্রে যেমন বিক্ষিপ্ত হয়, (ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম) ক্যাথোড রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্রে সেইরকম বিক্ষিপ্ত হয়।

- ক্যাথোড রশ্মি দ্বারা গ্যাস আয়নিত হয়।

কোন গ্যাসের মধ্য দিয়ে ক্যাথোড রশ্মি পাঠালে, ক্যাথোড রশ্মির প্রবল গতি যুক্ত ইলেকট্রন কণা গুলোর সঙ্গে গ্যাসের পরমাণু সংঘর্ষের ফলে, গ্যাসের পরমাণুগুলো আয়নে পরিণত হয়। ফলে গ্যাসটি তড়িৎ পরিবাহীতে পরিণত হয়।

- ক্যাথোড রশ্মিগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

কণাগুলি একই রকম তড়িৎগ্রস্ত বলে ক্যাথোড রশ্মির এই ধর্ম দেখা যায়।

- ক্যাথোড রশ্মি শক্তি বহন করে।

ক্যাথোডটি অবতল হলে, ওই অবতল থেকে নির্গত ক্যাথোড রশ্মি যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়, সেখানে একটি পাতলা প্লাটিনাম পাত রাখলে, পাতটি প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে। ইলেকট্রন কণা প্রচণ্ড বেগে প্লাটিনাম পাতের উপর পড়ে; ফলে ওদের গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

- ক্যাথোড রশ্মি তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়।

দুইটি বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত ধাতব পাতের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ক্যাথোড রশ্মি চালনা করলে দেখা যায়, ক্যাথোড রশ্মি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত পাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে বেঁকে যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলি ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্থ।

ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি

বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করে ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি জানা যায়। যেমন—

- চৌম্বক ক্ষেত্র ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা ক্যাথোড রশ্মির বিক্ষেপ থেকে আমরা জানতে পারি, ক্যাথোড রশ্মি নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্থ।
- ক্যাথোড রশ্মির আঘাতে বস্তুর মধ্যে গতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং ক্যাথোড রশ্মির ভরবেগ আছে।
- যেহেতু ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলি ঋণাত্বক তড়িৎগ্রস্ত এবং তীব্র ভরবেগ বিশিষ্ট সুতরাং বলা যায় যে, ক্যাথোড রশ্মি ঋণাত্বক তড়িৎগ্রস্থ কণার স্রোত মাত্র। এই কথাগুলোকে ইলেকট্রন বলে। অর্থাৎ, ক্যাথোড রশ্মি হলো তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন কণার অদৃশ্য স্রোত।

ক্যাথোড রশ্মি-এক্স রশ্মির মধ্যে পার্থক্য

ক্যাথোড রশ্মি এবং এক্স-রশ্মির মধ্যে অনেক তফাৎ বা পার্থক্য আছে। যেমন—

ক্যাথোড রশ্মি	এক্স-রশ্মি **(X-ray)**
ক্যাথোড রশ্মি হল ইলেকট্রন কণা স্রোত।	এক্স রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট উচ্চশক্তি সম্পন্ন তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।
ক্যাথোড রশ্মির জীবন্ত কোষ ধ্বংস করার ক্ষমতা কম।	জীবন্ত কোষ ধ্বংস করার ক্ষমতা ক্যাথোড রশ্মির চেয়ে এক্স রশ্মির অনেক বেশি।
ক্যাথোড রশ্মির গতিবেগ ধ্রুবক (স্থির) নয়।	এক্স রশ্মি আলোর বেগে চলে; অর্থাৎ এক্স রশ্মির গতিবেগ ধ্রুবক।
ক্যাথোড রশ্মির ভেদন ক্ষমতা এক্স রশ্মির তুলনায় খুবই কম।	এক্স রশ্মির ভেদন ক্ষমতা ক্যাথোড রশ্মির তুলনায় অনেক বেশি।
ক্যাথোড রশ্মির প্রতিটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক তড়িৎ এর পরিমাণ হল 1.6×10^{-19} কুলম্ব।	এক্স রশ্মি কোনোরকম তড়িৎযুক্ত নয়। এটি নিস্তড়িত।
ক্যাথোড রশ্মি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলোর নেগেটিভ তড়িৎ গ্রস্থ।	এক্স রশ্মি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
ক্যাথোড রশ্মি ধাতব পাতের উপর পড়লে ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করে।	এক্স-রে ধাতব পাতের উপর পড়লে ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করে না।
ক্যাথোড রশ্মি হল পদার্থ কণা। এই পদার্থ কণা অর্থাৎ ইলেকট্রন কণা নির্দিষ্ট ভরা আছে। একটি ইলেকট্রনের ভর হলো 9.11×10^{-28} গ্রাম।	এক্স-রে'র ভর নেই।
ক্যাথোড রশ্মির ভরবেগ আছে। কারণ এই রশ্মির গতিপথে পাখাযুক্ত হালকা চাকা রাখলে চাকাটি ঘুরতে থাকে।	এক্স-রে'র ভরবেগ নেই। তাই এক্স-রের গতিপথে পাখাযুক্ত হালকা চাকা রাখলে চাকাটি ঘরে না।

ক্যাথোড রশ্মি ও এক্স রশ্মির ধর্মের সাদৃশ্য

ধর্মের পার্থক্য থাকলেও ক্যাথোড রশ্মি ও এক্স রশ্মির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

ক্যাথোড রশ্মি	এক্স-রশ্মি **(X-ray)**
ক্যাথোড রশ্মি কাঁচ, জিংক সালফাইড, ক্যালসিয়াম টাংস্টেট, প্রভৃতির উপর আপতিত হয়ে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে। এ থেকে ক্যাথোড রশ্মির অস্তিত্ব বুঝা যায়।	এক্স-রে বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড, জিংক সালফাইড, ক্যালসিয়াম টাংস্টেট, প্রভৃতির উপর আপতিত হয়ে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে। এ থেকে এক্স-রের অস্তিত্ব জানা যায়।
ক্যাথোড রশ্মি অদৃশ্য	এক্স রশ্মিও অদৃশ্য।
ক্যাথোড রশ্মি গ্যাসকে আয়নিত করে।	এক্স-রে'ও গ্যাসকে আয়নিত করে।
ক্যাথোড রশ্মি সরলরেখায় চলে।	এক্স-রে'ও সরলরেখায় চলে।
ক্যাথোড রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেট এর উপর ক্রিয়া করে।	এক্স রশ্মিও ফটোগ্রাফিক প্লেট এর উপর ক্রিয়া করে।
উপযুক্ত অবস্থায় ক্যাথোড রশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ইত্যাদি হয়।	উপযুক্ত অবস্থায় এক্স রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি ঘটতে পারে।

গামা রশ্মি

যে সকল তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০ পিকোমিটারের চেয়ে ছোট তাদেরকে গামা রশ্মি বলে।

গামা রশ্মি একপ্রকার উচ্চ কম্পাঙ্কের খুব ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ। এটি এতই ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট, যা প্রায়শ অণুর আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট। তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালীতে হার্ড এক্স-রে আর গামা-রে এর অবস্থান একই জায়গায়। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনের ত্বরণের ফলে সৃষ্ট রশ্মিকে বলা হয় এক্স-রে আর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন রশ্মিকে বলা হয় গামা-রে বা গামারশ্মি বা গামা বিকিরণ। একে গ্রিক অক্ষর γ (গামা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি বিভিন্ন সাব-এটমিক কণার মিথস্ক্রিয়া, যেমন ইলেক্ট্রন-পজিট্রন অবলুপ্ত প্রক্রিয়া, পাইয়ন অবক্ষয়, তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়, ফিউশন বিক্রিয়া, ফিশন বিক্রিয়া, বিপরীত কম্পটন বিচ্ছুরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি হয়। এছাড়া রেডিও আইসোটোপ (Radioisotopes) থেকে গামা রশ্মি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। রেডিও আইসোটোপ হচ্ছে এমন একটা আইসোটোপ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রদর্শন করে। গামা রশ্মির কম্পাংক সাধারণত $১০^{১৯}$ হার্টজের উপরে, তাই এর শক্তি ১০০ কিলো ইলেকট্রন-ভোল্ট উপরে। সীসা বা কংক্রিটের মতো ঘন উপাদান দ্বারা গামা বিকিরণের গতি রোধ করা যায়।

কঠিন রঞ্জন রশ্মি বা হার্ড এক্স-রে এর পর ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক অনুসারে আসে গামা রশ্মি। এটি হল সবচেয়ে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটনের স্রোত এবং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো নিম্নসীমা নেই।

গামা রশ্মির ব্যবহার

জ্যোতির্বিদ্যায় উচ্চশক্তি সম্পন্ন মহাজাগতিক বস্তু পর্যবেক্ষন করার জন্য গামা রশ্মি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও রঞ্জন রশ্মিও পর্যবেক্ষন করার মতো এক্ষেত্রে ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে বায়ুমণ্ডলের বাহিরে স্থাপন করা হয়। উচ্চভেদন ক্ষমতার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণামূলক পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ধাতব বস্তুতে ফাটল নির্ণয়ে গামা রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে গামা রশ্মির নানাবিধ ব্যবহার আছে। সিটি স্ক্যান, রেডিও থেরাপি, ক্যান্সার চিকিৎসায় গামা রশ্মি কিংবা রঞ্জন রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য ইরেডিয়েশন (irradiation), বীজের জীবাণু মুক্তকরণ, চিকিৎসাক্ষেত্রে রেডিয়েশন ক্যান্সার থেরাপী (radiation cancer therapy), পারমাণবিক ঔষধ (nuclear medicine) তৈরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়। কম্পটন বিক্ষেপনের (Compton scattering) দ্বারা খুব নির্ভুলভাবে গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করা সম্ভব।

গামা রশ্মির আবিষ্কার

ফরাসি রসায়নবিদ এবং পদার্থবিজ্ঞানী পল ভিলার্ড ১৯০০ সালে রেডিয়াম বিকিরণ নিয়ে পরীক্ষা করার সময় গামা রশ্মি আবিষ্কার করেন। ইতঃপূর্বে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড আলফা রশ্মি এবং বিটা রশ্মি নামের দুই প্রকার বিকিরণ ১৮৯৯ এবং ১৯০৩ সালে আবিষ্কার কারেন। রাদারফোর্ড ভিলার্ডের এই নতুন আবিষ্কৃত বিকিরণের নাম দেন গামা রশ্মি।

[আমাদের ধারাবাহিক আলোচনায় পরবর্তীতে বিভিন্ন পারমাণবিক বিকিরণ : আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি ইত্যাদি স্থান পাবে -ইনশাআল্লাহ]

পরমাণু স্থিতিশীল হওয়ার জন্য, নিউক্লিয়াস একটি আলফা কণা (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) বা বিটা কণা (একটি বৈদ্যুতিন বা পজিট্রন) নির্গত করতে পারে। প্রায়শই, এইভাবে একটি কণা হারাতে নিউক্লিয়াস একটি উত্তেজিত অবস্থায় চলে যায়। তারপরে, নিউক্লিয়াস গামা রশ্মি নির্গত করে তথা ফোটনের আকারে অতিরিক্ত শক্তি প্রকাশ করে। এজন্য গামা রশ্মিকে পারমাণবিক বিকিরণ হিসাবেও অভিহিত করা হয়।

গামা নির্গমনকারী পরমাণু সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া: সাইন্টিগ্রাফি

গামা ক্যামেরা বা সাইন্টিলেশন ক্যামেরা বা অ্যাঙ্গার ক্যামেরা একধরনের যন্ত্র যা গামা বিকিরণ নির্গমনকারী রেডিও আইসোটোপসমূহ ইমেজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই প্রযুক্তিকে বলা হয় সাইন্টিগ্রাফি।

তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে গামা রশ্মি নির্গত হয় বলে একে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলা হয়। ভারী এবং অস্থিত তেজস্ক্রিয় মৌল গামা রশ্মি নির্গত করে থাকে। এটি নির্গমনের সাথে কোনো প্রোটন, নিউট্রন বা ইলেকট্রনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বা রূপান্তর ঘটে না।

গামা রশ্মির ধর্ম

1. গামা রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।
2. গামা রশ্মির কোনো ভর নেই।
3. গামা রশ্মির কোনো চার্জ নেই।
4. গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় অনেক কম।
5. গামা রশ্মি 3×10^{8} ms^{-1} বেগে গমন করে।
6. গামা রশ্মি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
7. গামা রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
8. গামা রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
9. এরা কোনো পদার্থের উপর আপতিত হয়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
10. গামা রশ্মির আয়নায়ন ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা আলফা এবং বিটা রশ্মির তুলনায় অনেক কম।
11. গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা আছে। আলফা এবং বিটা রশ্মির তুলনায় এই ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি।
12. এটা আলোকের মতো বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বলে গামা রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ইত্যাদি সব আলোকীয় ধর্ম আছে।

গামা রশ্মির ক্ষতিকর দিক

গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক থাকার কারণে এটা জীবদেহের ভেতরে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যেমন—

- এ রশ্মি দেহের কোষ নষ্ট করতে পারে।
- এ রশ্মির প্রভাবে মাথার চুল পড়ে যায়।
- এ রশ্মিতে আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার ও টিউমার হতে পারে।
- অতিমাত্রায় এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

এক্স-রশ্মি ও গামা রশ্মি মধ্যে সাদৃশ্য

- এক্স-রশ্মি ও গামা রশ্মি উভয়েই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।
- এরা তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
- উভয়ের বেগ শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগের সমান। অর্থাৎ 3×10^{8} ms^{-1}।
- এরা গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে। অর্থাৎ গামারশ্মি ও এক্স-রশ্মি উভয়ই আয়োনাইজিং বিকিরণ।
- এছাড়া উভয়েই ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ক্রিয়া করে।

এক্স-রশ্মি এবং গামা রশ্মি মধ্যে পার্থক্য

- এক্স রশ্মির তুলনায় গামা রশ্মি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন।
- গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা এক্স রশ্মির চেয়ে অনেক (প্রায় ১০০ গুণ) বেশি।
- গামা রশ্মির চেয়ে এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি।
- এক্স-রশ্মির তুলনায় গামা রশ্মি উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট।
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে গামা রশ্মির তুলনায় এক্স-রশ্মি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

পরবর্তী পর্বগুলোতে পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক বিকিরণ, তেজস্ক্রিয়তা, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়, শাব্দ ও মহাকর্ষীয় বিকিরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।